# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

পঞ্চষষ্টিতম বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

# বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী

**প্রাচীন ভারতে নারী** ২·০০

প্রাচীন ভারতে নারীর অবস্থা ও অধিকার সম্বন্ধে শাস্ত্র-প্রমাণযোগে বিস্তৃত আলোচনা।

শ্রীসুখময় শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ

**তন্ত্রপরিচয়** ২·০০

হিন্দুধর্মে তন্ত্রের প্রভাব, আগমাদি সংজ্ঞার অর্থ, তন্ত্রের কর্মকাণ্ড ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা।

**মীমাংসাদর্শন** ১·০০

মীমাংসা-শাস্ত্রে প্রবেশেচ্ছু পাঠকগণের উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রচিত।

**মিতাক্ষরা : দায়ভাগ** ৩·০০

বঙ্গানুবাদ-সহ মিতাক্ষরার দায়ভাগ-প্রকরণ বোধ হয় ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। অনুবাদে আক্ষরিক অর্থকে রক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে।

**জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তর** ৫·৫০

পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য টিপ্পনী ও বঙ্গানুবাদ সংযোজন করিয়া এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় সম্পাদন করা হইয়াছে।

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

**শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার** ২·৫০

আচার্য শান্তিদেবের অপূর্ব গ্রন্থ বোধিচর্যাবতারের সরল অনুবাদ।

**মৈত্রীসাধনা** ০·৫০

প্রাচীন ভারতে বৈদিক ও বৌদ্ধসাধকগণের মৈত্রীসাধনার যে পরিচয় আমরা সংস্কৃত সাহিত্যে পাই, এই গ্রন্থ তাহার উদ্‌ধৃতি সহযোগে আলোচনা।

প্রবোধচন্দ্র বাগচী-সম্পাদিত

**সাহিত্যপ্রকাশিকা** প্রথম খণ্ড ১০·০০

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল সম্পাদিত কবি দৌলত কাজির 'সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রাণী', এবং শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বাংলার নাথসাহিত্য' এই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত

**সাহিত্যপ্রকাশিকা** দ্বিতীয় খণ্ড ৬·০০

শ্রীরূপগোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' বিশিষ্ট সংস্কৃত প্রমাণগ্রন্থ। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এই গ্রন্থের ভাবানুবাদ হয়। বিভিন্ন নামে এই অনূদিত গ্রন্থের পুঁথি উত্তরবঙ্গে ও পশ্চিম-বঙ্গে পাওয়া গিয়াছে। সেই সকল প্রাচীন পুঁথি অবলম্বনে তুলনামূলক বিচার ও বিস্তৃত ভূমিকার সহিত শ্রীদুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত।

**চিঠিপত্রে সমাজচিত্র** দ্বিতীয় খণ্ড ১৫·০০

বিশ্বভারতী-সংগ্রহ হইতে ৪৫০ ও বিভিন্ন সংগ্রহের ১৮২ : মোট ৬৩২খানি পুরাতন (খ্রী ১৬৫২-১৮৯২) চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজের সংকলনগ্রন্থ।

**পুঁথি-পরিচয়** ১০·০০

বিশ্বভারতীর বাংলা পুঁথিশালায় সংগৃহীত মোট ছয় হাজার পুঁথির মধ্যে এই গ্রন্থে পাঁচ শত পুঁথির সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

**গোর্খ-বিজয়** ৫·০০

নাথসম্প্রদায় সম্পর্কে অপূর্ব গ্রন্থ। সম্পাদকীয় বিস্তৃত ভূমিকায় ও ডাক্তার সুকুমার সেন লিখিত বিশেষ ভূমিকায় নাথসম্প্রদায়ের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে।

## বিশ্বভারতী

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

শ্রী যদুনাথ সরকার
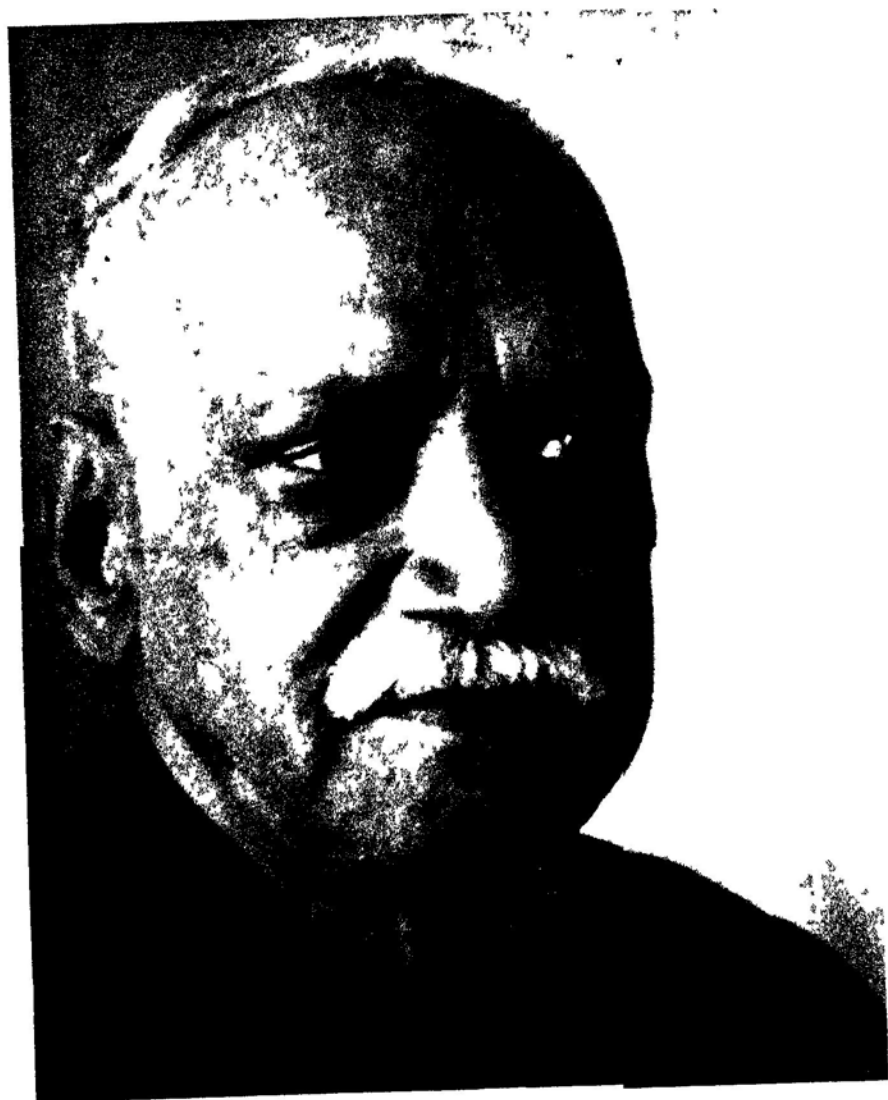
জন্ম ১৮৭০। মৃত্যু ১৯৫৮

শ্রীদীপক সরস্বতী গৃহীত চিত্র

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৬৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
১৩৬৫

# রজনীকান্ত সেনের কাব্য

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

অদৃষ্টবিধাতা কোনো কোনো স্বনির্ব্বাচিত পুরুষের জন্য স্বহস্তে গৌরবের মুকুট প্রস্তুত করিয়া থাকেন, সে মুকুটের উপাদান বেদনার স্বর্ণ ও অশ্রুর মুকুতা। চর্ম্মচক্ষের অভিজ্ঞতায় মনে হয় যে সেই দুরূহ সৌভাগ্যের ভারে হতভাগ্যের সমস্ত জীবন ও যাবতীয় আশাভরসা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, তখন বিধাতা যে কী আত্মপ্রসাদ লাভ করেন কে বলিবে। তবে কখনো কখনো বিধাতার মর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির চোখে এ হেন দৃশ্য পড়িলে তিনি প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন, তিনি দেখেন যে বিধাতাপুরুষ মানবাত্মার মহত্ত্বের যাচাই করিয়া লইতেছেন, দেহ ও আত্মার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আত্মার জয় দেখিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা-পরিসীমা থাকিতেছে না।

ক্যানসার-রোগাক্রান্ত নিশ্চিতমৃত্যু রজনীকান্তকে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন তাহা বিধাতার মর্ম্মগ্রাহিতায় পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

"প্রীতিপূর্ণ নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থি-মাংস, স্নায়ু-পেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও কোনোমতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। মনে আছে, সেদিন আপনি আমার 'রাজা ও রাণী' নাটক হইতে প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—

এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ় বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয় ?

ঐ কথা হইতে আমার মনে হইতেছিল, সুখদুঃখ-বেদনায় পরিপূর্ণ এই সংসারের প্রভূত শক্তির দ্বারাও কি ছোট এই মানুষটির আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না ? শরীর হার মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই—কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই—পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে, অগ্নি আরো তত বেশি করিয়াই জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্ত স্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে ? মানুষের আত্মার সত্য-প্রতিষ্ঠা যে কোথায়, তাহা যে অস্থি-মাংস ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার

মধ্যে নহে, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। সছিদ্র বাঁশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সঙ্গীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগক্ষত, বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য্য।...

"আপনি যে গানটি [ 'আমায় সকল রকমে,... ] পাঠাইয়াছেন তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম। সিদ্ধিদাতা তো আপনার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই, সমস্তই তো তিনি নিজের হাতে লইয়াছেন—আপনার প্রাণ, আপনার গান, আপনার আনন্দ সমস্তই তো তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে—অন্য সমস্ত আশ্রয় ও উপকরণ তো একেবারে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর যাঁহাকে রিক্ত করেন, তাঁহাকে কেমন গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন; আজ আপনার জীবন-সঙ্গীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষা-সঙ্গীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে।"

রবীন্দ্রনাথের পত্র নিশ্চিতমৃত্যুপথযাত্রীকে বৃথা সান্ত্বনা দান নয়, রুগ্ন কবি সম্বন্ধে অবধারিত সত্য। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত কবি যে প্রফুল্লতা, ধীরতা ও শান্তি দেখাইয়াছেন তাহা ভগবানে গভীর বিশ্বাস ব্যতীত সম্ভব নয়। জীবনের আর সব সম্বল যখন ফুরাইয়া যায়, তখন ঐটুকুই হাতে থাকে, যাহার হাতে থাকে সত্যই সে পরম সৌভাগ্যবান্। মৃত্যুশয্যায় শয়ান স্যার ওয়াল্টার স্কট জামাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—বৎস, এই অবস্থায় উপস্থিত হইলে পবিত্র জীবনের স্মৃতি ছাড়া আর কিছুতেই সান্ত্বনা পাইবে না। 'সকল রকমে কাঙাল' রজনীকান্তও শেষ শয্যায় উপনীত হইয়া একমাত্র পবিত্র জীবনের স্মৃতির উপরে নির্ভর করিয়াই ধীরতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সে-সময় হাসপাতালে তাঁহাকে যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই রবীন্দ্রনাথের মতো মুগ্ধ বিস্ময় অনুভব করিয়াছেন। কান্তকবি স্বদেশী গানের কবি, হাসির গানের কবি, আবার ভক্তি-সঙ্গীতের কবি। কিন্তু জীবনের দুর্ব্বহ শেষ কটি মাস প্রমাণ করিয়া দিল তাঁহার যথার্থ শক্তি কোথায়। ঐ ভক্তির মূল অস্তিত্বের গভীরে নিহিত ছিল বলিয়াই কবিকে খাড়া করিয়া রাখিয়াছিল, তুলনায় সামান্য আঘাতে অনেক অন্তঃসারশূন্য মহীরুহ ভাঙিয়া পড়ে। দুর্ব্বহ অন্তিম এই কয়টি মাসকেই তাঁহার জীবনের অক্ষয় কিরীট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। কী প্রয়োজন ছিল এই কণ্টক-মুকুটের? বিধাতা বোধ করি মাঝে মাঝে নিজের সৃষ্টির শক্তি যাচাই করিয়া দেখেন।

## ২

"পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে সম্ভ্রান্ত বৈদ্য-বংশে ১৮৬৫ সনের ২৬শে জুলাই (১২৭২, ১২ই শ্রাবণ) বুধবার রজনীকান্তের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা গুরুপ্রসাদ সেন তখন কাটোয়ার মুনসেফ।"

রজনীকান্ত মূলতঃ পাবনার অধিবাসী হইলেও রাজসাহীর লোক বলিয়াই পরিচিত

ছিলেন, তিনি নিজেও সেইরূপ মনে করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত গোবিন্দনাথ সেন রাজসাহীর খ্যাতনামা উকীল ছিলেন, সেই সূত্রে রাজসাহী তাঁহার আপন স্থান হইয়া উঠিল। কালক্রমে তিনি রাজসাহীর প্রধান অলঙ্কারে পরিণত হইলেন।

রজনীকান্ত প্রভূত মেধার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও স্কুল-কলেজের পাঠে কখনো মনোযোগী ছিলেন না—তাই পরীক্ষাগুলি কোনোরকমে পাশ করিয়া রাজসাহী শহরে ওকালতী ব্যবসা সুরু করিলেন।*

ওকালতী আরম্ভ হইল সেই সঙ্গে আরম্ভ হইল প্রবল সাহিত্য সাধনা। একটা পেশা, অন্যটা নেশা। নেশার কাছে পেশা পারিবে কেন? এই বিসদৃশ অবস্থা সম্বন্ধে তিনি দিঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমারকে লিখিতেছেন—

"কুমার, আমি আইন-ব্যবসায়ী, কিন্তু আমি ব্যবসায় করিতে পারি নাই। কোন্ দুর্লঙ্ঘ্য অদৃষ্ট আমাকে ঐ ব্যবসায়ের সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল কিন্তু আমার চিত্ত উহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। আমি শিশুকাল হইতে সাহিত্য ভালবাসিতাম, কবিতার পূজা করিতাম, কল্পনার আরাধনা করিতাম। আমার চিত্ত তাই লইয়া জীবিত ছিল।"

মধুসূদনও এই রকমটি লিখিলে লিখিত পারিতেন। ওকালতীর সাহারায় সাহিত্য ও সঙ্গীতের উৎস অবলম্বন করিয়া তিনি দিনগত পাপক্ষয় করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ঐতিহাসিক ও সাহিত্যরসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জন্মে। তিনিও রজনীকান্তের মতো অন্য জেলার লোক হইয়াও রাজসাহীর অধিবাসী বলিয়া পরিচিত। অক্ষয়কুমার পেশায় উকীল, নেশায় প্রত্নতত্ত্ববিদ্, তার উপরে সাহিত্যিক। তাঁহার কাছে উৎসাহ ও প্রশ্রয় পাইয়া রজনীকান্ত সাফল্যের পথে চলিলেন। এই রাজসাহী শহরেই আর দুইজন ব্যক্তির সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে, যাঁহাদের প্রভাব অল্পাধিক পরিমাণে তাঁহাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। তাঁহারা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও জলধর সেন।

রাজসাহীতে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসিবার সঙ্গেই রজনীকান্ত রাজসাহী শহরের 'উৎসবরাজে' পরিণত হইলেন। সাহিত্যসভা, গানের মজলিশ, লাইব্রেরি, সাহিত্য-সম্মিলন, সর্ব্বত্র রজনীকান্তকে চাই। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিদায় বা সম্বর্দ্ধনা-সভায় গান লিখিয়া দিতে রজনীকান্তকে চাই।

"এক রবিবারে রাজসাহীর লাইব্রেরিতে কিসের জন্য যেন একটা সভা হইবার কথা ছিল। রজনী বেলা প্রায় তিনটার সময়ে অক্ষয়ের (মৈত্র) বাসায় আসিল। অক্ষয় বলিল, 'রজনীভায়া, খালি হাতে সভায় যাইবে। একটা গান বাঁধিয়া লও না।' রজনী যে গান বাঁধিতে পারিত, তাহা আমি জানিতাম না, আমি জানিতাম; সে গান গাহিতেই পারে।

---

| | | |
|---|---|---|
| * ১৮৮৩ | এন্ট্রান্স, তৃতীয় বিভাগ | কুচবিহার জেনকিন্স স্কুল, ১৭ বৎসর বয়স |
| ১৮৮৫ | এফ. এ. দ্বিতীয় বিভাগ | রাজসাহী কলেজ |
| ১৮৮৯ | বি. এ. | সিটি কলেজ |
| ১৮৯১ | বি. এল. দ্বিতীয় বিভাগ | সিটি কলেজ |

আমি বলিলাম, 'এক ঘণ্টা পরে সভা হইবে, এখন কি আর গান বাঁধিবার সময় আছে?' অক্ষয় বলিল, 'রজনী একটু বসিলেই গান বাঁধিতে পারে।' রজনী অক্ষয়কে বড় ভক্তি করিত। সে তখন টেবিলের নিকট একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া অল্পক্ষণের জন্য চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল। তাহার পরেই কাগজ টানিয়া লইয়া একটা গান লিখিয়া ফেলিল। আমি তো অবাক্। গানটা চাহিয়া লইয়া পড়িয়া দেখি, অতি সুন্দর রচনা হইয়াছে। গানটি এখন সর্ব্বজন-পরিচিত—

তব, চরণ-নিম্নে, উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা।"

—জলধর সেন

অকালে অকস্মাৎ যে-কোনো উপলক্ষ্যে গান বাঁধিয়া দিতে ও গান গাহিয়া আসর মাত করিতে রজনীকান্তকে চাই। ক্রমে তিনি রাজসাহীর আনন্দ, উৎসাহ, প্রাণ হইয়া উঠিলেন। এমন লোককে 'উৎসবরাজ' বলিয়া বোধ করি অন্যায় করি নাই।

এইভাবে সাহিত্য, সঙ্গীত এবং ওকালতীর নেশায় পেশায় যখন তাঁহার জীবন চলিতেছিল এমন সময়ে ১৯০৯ সালের গ্রীষ্মকালে তাঁহার গলায় ক্যানসার রোগ দেখা দিল। এবারে শুরু হইল তাঁহার জীবনমরণের দ্বন্দ্ব, আরম্ভ হইল দুরূহ সৌভাগ্যের মুকুট-ধারণের পালা।

জীবনের শেষ কয় মাস মেডিকেল কলেজে কাটাইয়া দীর্ঘ দেড় বৎসর রোগভোগের পরে ১৯১০ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর রজনীকান্ত সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিলেন।

মেডিকেল কলেজে বাসকালে দেশের ছোট বড় অসংখ্য লোকের যে স্নেহ-করুণা তাঁহার উপরে বর্ষিত হইয়াছিল তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে কান্তকবির রচনা দেশের মনকে ব্যাপকভাবে স্পর্শ করিয়াছিল, তিনি যে লিখিয়াছিলেন—

'ভাবিতাম আমি লিখি বুঝি বেশ
আমার সঙ্গীত ভালোবাসে দেশ'

তাহা আদৌ অলীক বা অত্যুক্তি নয়। কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, দিঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায় প্রভৃতি ভূস্বামীগণ, মধ্যবিত্তসম্প্রদায়ের ব্যবসায়ী, সমব্যবসায়ী ও বন্ধুগণ, মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক ও শিক্ষার্থীগণ সকলেই নিজ নিজ সাধ্যানুসারে মৃত্যুপথযাত্রীর পথ সুগম ও দুশ্চিন্তা লাঘব করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আর এ সহৃদয়তা তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গেই অবসিত হয় নাই। প্রথমোক্ত দুই মহানুভব ব্যক্তির বদান্যতা স্বর্গত কবির অনাথ পরিবারবর্গকে পরিত্যাগ করে নাই। লক্ষ্মী সরস্বতীর কলহ সর্ব্বথা সত্য নয়।

৩

রজনীকান্তের সাহিত্যসৃষ্টির পরিমাণ খুব বেশী নহে। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনখানি এবং মৃত্যুর পরে পাঁচখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল।*

তাঁহার সমস্ত রচনাই পদ্যে, তাহার অধিকাংশই আবার গীত। গীত বা গীতিকবিতাকেই তাঁহার প্রতিভার প্রধান বাহন বলা যাইতে পারে।

তাঁহার রচিত গানগুলি সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর, ভক্তিমূলক, স্বদেশী গান ও হাসির গান। অমৃত ও সদ্ভাব-কুসুম গান নয়, নীতিকবিতা, কবির স্বীকৃতি অনুসারে রবীন্দ্রনাথের কণিকার আদর্শে রচিত।

লেখকের বহুবিধ প্রবণতার মধ্যে মুখ্য ও গৌণে প্রভেদ করা সমালোচকের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। গোড়াতে এই ভাগটা করিয়া লইলে পরিণামে অনেক ভুল বোঝার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

রচনার উৎকর্ষ ও পরিমাণ হিসাব করিলে স্বীকার করিতে হয় যে ভক্তিমূলক গানেই কবির প্রতিভার প্রকৃষ্টতম প্রকাশ, ইহাই তাঁহার মুখ্য প্রবণতা। স্বদেশী গান, হাসির গান ও নীতিকবিতা তুলনায় গৌণ। গৌণের বিচার আগে সারিয়া লওয়া যাইতে পারে, স্বভাবতঃই তাহা সংক্ষিপ্ত হইবে।

রাজসাহীতে দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত পরিচয় রজনীকান্তকে হাসির গান রচনায় প্রেরণা দেয়, স্পষ্টতঃ এখানে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান তাঁহার আদর্শ। সাহিত্যে হাসির সীমানা কালে কালে ও দেশে দেশে বদল হইয়া থাকে। এক দেশ যে বিষয়কে হাস্যকর মনে করে অন্য দেশ তাহা না করিতেও পারে, এক যুগ যে বিষয়কে হাস্যকর মনে করে অন্য যুগ তাহা না করিতেও পারে। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের জৌলুষ এক সময়ে যেমন ছিল এখন আর তেমন নাই। যুগাত্যয়ে রুচির বদল হইয়াছে, সে যুগের তুলনায় বর্ত্তমান কাল কিছু গম্ভীর ও আত্মসচেতন হইয়া পড়িয়াছে—সাহিত্যে হাসি এখন সম্পূর্ণ taboo না হইলেও তাহার স্থান এখন সঙ্কীর্ণ। রজনীকান্তের হাসির গান সম্বন্ধেও এ কথা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। দ্বিজেন্দ্রলাল বা রজনীকান্ত কাহারও হাসির গান এখন বড় শুনিতে পাওয়া যায় না। তবে পুনরায় যুগাত্যয়ে

---

* ১. বাণী (কাব্য)। ১৯০২

২. কল্যাণী (কাব্য)। ১৯০৫

৩. অমৃত (নীতিকবিতা)। ১৯১০

মৃত্যুর পরে প্রকাশিত

৪ আনন্দময়ী (আগমনী ও বিজয়াসঙ্গীত)। ১৯১০

৫ বিশ্রাম (কাব্য)। ১৯১০

৬. অভয়া (কাব্য)। ১৯১০

৭. সদ্ভাব-কুসুম (নীতিকবিতা)। ১৯১৩

৮. শেষ দান (কাব্য)। ১৯২৭

যে হাসির গানের আদর বাড়িবে না এমন বলা যায় না। তবে দুজনের হাসির গানের মধ্যে তুলনা করিলে বলা চলে যে, দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য অধিক হইলেও উৎকর্ষে রজনীকান্তের হাসির গান ন্যূন নহে। তাঁহার হাসির গান মূলে দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বারা প্রভাবিত ও প্রেরণাপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও এক জায়গায় রজনীকান্তের জিত—তাঁহার হাসিতে করুণায় যেমন মাখামাখি দ্বিজেন্দ্রলালের তেমন নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান যদি শুষ্ক শীতের বাতাস হয়, রজনীকান্তের হাসির গান বর্ষার জলভারাক্রান্ত পূবে বাতাস।

## ৪

স্বদেশী যুগে স্বদেশী গান লেখেন নাই এমন বাঙালী কবি বোধ হয় ছিলেন না। রজনীকান্তও লিখিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রবল প্রভাবটা সেই যুগের হাওয়ার, তার পরেই রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের। রজনীকান্তের স্বদেশী গানে অগ্রজ কবিদ্বয়ের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গান সর্ব্বত্র লিরিক্যাল, গানের সীমানা ত্যাগ করিয়া বক্তৃতার সীমানায় কখনও পদার্পণ করে নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গান প্রায় সর্ব্বত্র oratorical, তাহা যেন গানে বক্তৃতা। এগুলির তৎকালীন জনপ্রিয়তার মূল এখানে, বক্তৃতার প্রেরণা যেমন সহজ, গানের প্রেরণা তেমন নয়। আবার এগুলির বর্ত্তমান অনাদরের মূলও এখানে, বক্তৃতা যত শীঘ্র পুরাতন হয় গান তেমন হয় না। এখন রজনীকান্তের স্বদেশী গানে এ দুটি গুণই দেখিতে পাওয়া যায়।

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই
দীন দুখিনী মা যে মোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই—

এ রচনার ছাঁচ লিরিক্যাল, সুরে গীত না হইলেও এ গান।

আবার—

রাম-যুধিষ্টির ভূপ-অলঙ্কৃত,
অর্জ্জুন ভীষ্ম শরাসন টঙ্কৃত,
বীর প্রতাপে চরাচর শঙ্কিত।

এ রচনা "মিশ্র পরোজ-কাওয়ালী" রাগিণীতে গীত হইলেও লিরিক নয়, বক্তৃতা।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গানের আদর যে কমিয়াছে, স্বদেশী যুগের অবসান তাহার কারণ নয়—উহার বক্তৃতাত্মক ছাঁচটাই কারণ। ঐ একই কারণে রজনীকান্তের স্বদেশী গানের সে আদর আর নাই, কাল ও ছাঁচ দুই-ই চিরকালীন সমাদরের অন্তরায়।

৫

রজনীকান্তের নীতিকবিতাগুলির বর্ত্তমান অনাদরের কারণ বুঝিতে পারি না। এ গুলি স্পষ্টত: (কবি কর্ত্তৃক স্বীকৃতও বটে) কণিকার আদর্শে লিখিত হইলেও ইহারা সরসতায়, ভূয়োদর্শনে ও মৌলিকতায় 'কণিকা'র অনুজ। খুব সম্ভব অনাদরের কারণ হইতেছে সাধারণ ভাবে রজনীকান্তের কাব্য সম্বন্ধে পাঠকের অবহেলা ও বিস্মৃতি। কবির ভক্তিসঙ্গীতগুলির পরেই, হাসির গান ও স্বদেশী গানের উপরে, নীতিকবিতা গুলির আসন।

৬

বাংলা দেশের ভক্তিসাধনার একটি নিজস্ব ধারা আছে, বহুকালের প্রাচীন এই ধারা। এই ভক্তিসাধনার প্রকৃতি হইতেছে ভগবানের কাছে ভক্তের আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পিত প্রাণ ভক্তকে ভগবানের অপার করুণা রক্ষা করে, দুর্গম পথে চালনা করে এবং শেষ পর্য্যন্ত চরম সার্থকতায় পৌছাইয়া দেয়। প্রধানত: সঙ্গীতে ভক্ত আত্মনিবেদন করিয়া থাকে। সঙ্গীত এখানে মন্ত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে। তাই দেখিতে পাই ভক্তিসাধনার সমান্তরালে একটি, সঙ্গীতের প্রবাহ সৃষ্টি হইয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, বাউল ও অন্যান্য লোকসঙ্গীত—সমস্তই এই ধারার অন্তর্গত। ব্রহ্মসঙ্গীত ও রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মসঙ্গীতকেও এই ধারার অন্যতম রূপ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

রজনীকান্তের কান্তপদাবলীও এই ভক্তিসঙ্গীতধারার অন্তর্গত। ভক্ত ও ভগবান্ সম্পর্কিত নূতন কোনো তত্ত্ব বা পন্থা তিনি উদ্ভাবন করেন নাই; বোধ করি ভক্তির প্রকৃতি এই যে তত্ত্ব বা নূতন পন্থার দিকে তাহা ঝোঁকে না, চোখ বুজিয়া আত্মসমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হয়। কাজেই কান্তপদাবলীর তাত্ত্বিক ভিত্তি আলোচনা নিরর্থক। ভক্তির অকৃত্রিমতাই উহার প্রধান সম্পদ।

বাণী ও কল্যাণী হইতে অনেক পদ উদ্ধার করিয়া বিষয়টি প্রমাণ করা যায়। কিন্তু তাহার প্রয়োজন আছে মনে করি না। ভক্তির মূলে আছে বিশ্বাস। বিশ্বাস না থাকিলে ভক্তি সম্ভব নয়। কাজেই তাঁহার বিশ্বাসদ্যোতক সঙ্গীতের সংখ্যাও প্রচুর।

কেন বঞ্চিত হব চরণে ?
আমি, কত আশা ক'রে ব'সে আছি,
পাব জীবনে, না হয় মরণে।

কিংবা—

তুমি অরূপ সরূপ, সগুণ নির্গুণ,
দয়াল ভয়াল হরি হে;

আমি কিবা বুঝি, আমি কিবা জানি,
আমি কেন ভেবে মরি হে।…
তাই বলে ডাকি যাহা প্রাণ চায়
ডাকিতে ডাকিতে হৃদয় জুড়ায়—

ইহাই তাঁহার ও ভক্তির অন্তর্নিহিত কথা। বিশ্বাস ও ভক্তি প্রাণে থাকিলে ভক্তের সংসার পথ সুগম হইয়া আসে, তখন মৃত্যুতেও সে অনায়াসে বলিতে পারে—

তোমারি দেওয়া প্রাণে তোমারি দেওয়া দুখ।…
তোমারি দেওয়া নিধি, তোমারি কেড়ে নেওয়া,

তখন মৃত্যুকেও 'তোমার রসাল নন্দন' বলিয়া মনে হয়।

কান্ত কবির ভগবদ্‌বিশ্বাসে এতটুকু কৃত্রিমতা ছিল না বলিয়াই তিনি দুর্ব্বহ পীড়ার অন্তিম মাস কয়েকটি গৌরব-কিরীটের মতো অনায়াসে শিরে বহন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এ কথা বলিলে কুটিল ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করা হইবে না যে, কান্তকবির ভক্তিসঙ্গীতগুলি বাংলা ভক্তিপদাবলীর জাহ্নবীতে যে একটি চির-সলিলা উপনদীরূপে যুক্ত হইয়া আমাদের মানসিক সম্পদকে চিরদিনের জন্য বাড়াইয়া দিয়াছে তাহা অবিনশ্বর।*

---

* এই প্রবন্ধ রচনায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার অন্তর্গত রজনীকান্ত সেন পুস্তিকার সাহায্য পাইয়াছি।

রজনীকান্ত সেন

জন্ম ১৮৬৫ মৃত্যু ১৯১০

অনুরূপা দেবী

জন্ম ১৮৮২ মৃত্যু ১৯৫৮

# বুদ্ধের দেশনা

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

ঐতিহাসিকগণের মতে ভগবান্ শৌদ্ধোদনি গৌতম বুদ্ধ খ্রী. পূ. ৫৬৩ অব্দে শাক্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং খ্রী. পূ. ৪৮৩ অব্দে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। ভারতবর্ষে নানা মতবাদ, নানা ধর্ম, নানা দর্শন যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়াছে। নানা মহাপুরুষের চরণরেণুর স্পর্শে এই প্রাচীন ভারতভূমি পূত হইয়াছে। বুদ্ধদেবের পূর্বেও ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা, ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনা, ভারতীয় সমাজপদ্ধতি উন্নত স্তরে আরোহণ করিয়াছিল। বৈদিক কর্মমার্গ, ঔপনিষদিক অধ্যাত্মবাদ, লৌকায়তিক নাস্তিকতা প্রভৃতি বিভিন্ন চিন্তাধারা ভগবান্ তথাগতের আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতেই ভারতীয়গণের মানসভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। বৈদিক কর্মমার্গ এবং ঔপনিষদিক অধ্যাত্মবাদের প্রভাবই ছিল সর্বাপেক্ষা দূরপ্রসারী ও গভীর। বৈদিক চাতুর্বর্ণ্য ও চাতুরাশ্রম্য প্রথা, বৈদিক আত্মদর্শন, বৈদিক পুনর্জন্মবাদ, বৈদিক কর্মবাদ এবং অদৃষ্টবাদ তাৎকালীন সমাজজীবনের প্রত্যেক স্তরে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছিল। এই প্রাচীন, চিরাচরিত, মহাজন-পরিগৃহীত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নাস্তিকতা বলিয়া পরিগণিত হইত।[1] সমাজে সেইরূপ বিদ্রোহীর স্থান ছিল না। যে সকল স্বাধীনচেতাঃ পুরুষ সেই প্রাচীন পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের স্বর ধ্বনিত করিয়া তুলিতে সাহসী হইতেন, তাঁহারা বহু স্থলেই জনসাধারণের হেয় হইতেন। তাঁহাদের অনুচরের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। ভগবান্ তথাগতের আবির্ভাবের সমকালে এইরূপ কয়েকজন নির্ভীক, চিন্তাশীল পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা প্রাচীন শ্রৌত ধর্ম, শ্রৌত দর্শন এবং শ্রৌত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপন আপন মতবাদ প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। পূরন কসপ, মক্খলি গোসাল, অজিত কেসকম্বলিন্, পকুধ কচ্চায়ন, সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্ত এবং নিগণ্ঠ নাতপুত্ত—এই ছয় জন 'তীর্থিক' বুদ্ধদেবের সমসাময়িক আচার্যরূপে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ এবং বৌদ্ধ পালিসাহিত্যে তাঁহাদের নাম এবং তাঁহাদের প্রচারিত মতবাদ বারংবার উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাঁদের মধ্যে সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্ত অজ্ঞেয়তাবাদিরূপে প্রসিদ্ধ—ইংরেজীতে যাহাকে Agnostic বলা যাইতে পারে। মক্খলি গোসাল কাহারও কাহারও মতে জৈনসম্প্রদায়ের প্রবর্তক ভগবান্ মহাবীরের গুরু ছিলেন, কাহারও কাহারও

---

১. তুলনীয়ঃ "বেদধর্মানুবর্তী চ প্রায়েণ সকলো জনঃ।
বেদবাহ্যস্তু যঃ কশ্চিদাগমো বঞ্চনৈব সা।"
—জয়ন্ত ভট্ট, ন্যায়মঞ্জরী, ১ম ভাগ, পৃ. ২৪৩ কাশী-সংস্করণ।

মতে বা শিষ্য। ইনিই 'আজীবিক'[১] নামে একটি বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের প্রবর্তকরূপে খ্যাত। নিগ্রন্থ নাথপুত্র ভগবান্ মহাবীরেরই অপর এক নাম। তিনি নিগ্রন্থ বা জৈনসম্প্রদায়ের প্রবর্তক আচার্যরূপে প্রসিদ্ধ। এই ছয় জন তীর্থিকগণের মধ্যে কেহই ব্রাহ্মণ ছিলেন না।[২] তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, দর্শন ও সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিজ নিজ মতবাদ প্রচার করিতেন। সুতরাং বুদ্ধদেব যখন ক্ষত্রিয় শাক্যকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন ব্রাহ্মণ্য আর্য বৈদিক সভ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহবহ্নি ধূমায়িত হইতেছিল। বুদ্ধদেবই সেই অন্তর্নিহিত বিপ্লবকে প্রকটিত করিয়া, তাহাকে একটি নূতন আকার দান করিলেন। বুদ্ধদেব নিজেও বৈদিক শাস্ত্রসমূহ শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর দুই জন ব্রাহ্মণ আচার্যের সকাশে বৈদিক অধ্যাত্মসাধন-পদ্ধতিতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম আড়ার কালাম এবং অপর জনের নাম উদ্দক। কিন্তু বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান, বৈদিক চাতুর্বর্ণ্য ও চাতুরাশ্রম্য প্রথা, ঔপনিষদিক আত্মতত্ত্ব, মীমাংসার কর্মবাদ, বৈদিক ঈশ্বরবাদ ইত্যাদি শ্রৌত মতবাদ বুদ্ধদেবের নিকট বিচারদৃষ্টিতে যুক্তিহীন ও ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। তিনি স্বকীয় যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া, স্বকীয় সাধনা ও উপলব্ধির সাহায্যে এই বিশ্বের মূল অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নিরূপণ করিবার জন্য যত্নবান্ হইলেন। তিনি শাস্ত্রের বাঁধা বুলি নীরবে স্বীকার করিয়া লইতে পারিতেন না। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ উপলব্ধি ও বুদ্ধি অনুসারে আপন আপন শ্রেয়ঃসাধনের পথ বাছিয়া লইবার অধিকার আছে—ঐ বিষয়ে শাস্ত্রের প্রভুত্ব অন্ধভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া ভীরুতা ও বিবেকহীনতার পরিচায়ক। বুদ্ধদেব যখনই তাঁহার বিশ্বস্ত শিষ্যগণের নিকট আপন মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, তখনই তিনি তাহাদের নিজ নিজ যুক্তির সাহায্যে সেই মতবাদের সত্যাসত্যত্ব পরীক্ষা করিয়া লইবার জন্য বারংবার উপদেশ দিয়াছেন—"স্বর্ণকার যেমন স্বর্ণপিণ্ড উত্তপ্ত করিয়া, ছেদন করিয়া, নিকষে ঘষিয়া উহার বিশুদ্ধি পরীক্ষা করিয়া লয়, সেইরূপ হে ভিক্ষুগণ! তোমরাও আমার উপদেশাবলী যুক্তির দ্বারা পরীক্ষা করিয়া লইতে ভুলিও না"—ইহাই ছিল ভগবান্ তথাগতের নির্দেশ।[৩] যুক্তির দ্বারা যে সকল তত্ত্ব জানিবার উপায়

---

১. "Those who 'follow the right or strict way or method of living: *Samma-ajiva*, the fifth section of the Noble Eightfold Path. They were solitary, or rather independent, naked ascetics of an extreme cynic and pessimistic type....They are mentioned along with the Brahmans and Jains in Asoka's sixth Pillar Edict, and received benefactions from that tolerant emperor."—J. G. Jennings: *The Vedantic Buddhism of the Buddha*, p. cxii, f. n. 5.

২. "All the six leaders ignored, as did Gotama, the Vedic rites and the claims of the Brahmans to religious dominance. None of them belonged to the Brahman caste, and two at least of the seven, Nathaputta and Gotama, were members of the Ksatriya or martial caste."—ঐ, পৃ. cxiii.

৩. ভট্ট কুমারিলও তাঁহার 'তন্ত্রবার্তিকে' বুদ্ধদেবের ধর্মদেশনার যুক্তিমূলকতা স্বীকার করিয়াছেন। দ্রষ্টব্য ত° বা° পৃ. ১১৭।

অপিচ—"Kumarila asserts with perfect truth that the teaching of the Buddha is supported by reasoning"—A. B. Keith. *Buddhist Philosophy*.

ছিল না, কিংবা যে সকল তত্ত্বের অনুসন্ধানের ফলে ইহজীবনে দুঃখ ও অশান্তির কোনওরূপ প্রতিকার সম্ভব হইতে পারিত না, এমন কোনও বিষয়ে বুদ্ধদেব কখনও কোনও দেশনা করিতেন না; ইহা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। শরাহত ব্যক্তি যখন শরবিদ্ধ অবস্থায় চিকিৎসার জন্য আনীত হইয়া থাকে, তখন বৈদ্য যদি, 'শরটি কাহার দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল? কি উপাদানের দ্বারা সেই শরটি নির্মিত?' ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধানে যত্নবান্ হন, সত্বর শরটি ক্ষতস্থান হইতে উদ্ধার করিয়া উহাতে ঔষধপ্রয়োগ না করেন, তবে যেমন সেই ক্ষতের কোনও আরোগ্য হয় না, সেইরূপ যে সকল বিষয়ের নিরূপণের দ্বারা দুঃখ ব্যাধি-জরা-মরণ-সমন্বিত এই সংসারের উপশম আনয়ন করা যায় না, ভবযন্ত্রণা-পীড়িত জীবগণের চিত্তে শান্তি আনয়ন করা যায় না, সেই সকল বিষয়ের নিরূপণ নিষ্ফল। যখনই কোনও শিষ্য ভগবান্ তথাগতকে সেইরূপ কোনও বিষয়ে—যথা, ঈশ্বর, পরলোক ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাঁহার স্বকীয় মতবাদ জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন, তখনই তিনি মৌনভাব অবলম্বন করতঃ ঐরূপ অনুসন্ধানের নিষ্ফলতা বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। যে সকল তত্ত্ববিষয়ে ভগবান্ বুদ্ধদেব কোনও দেশনা করেন নাই, সেই সকল তত্ত্ব বৌদ্ধ ত্রিপিটকে 'অব্যাকত' (সংস্কৃত 'অব্যাকৃত'=unexplained)রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। সুত্রপিটকের বহু স্থলে এইরূপ অব্যাকৃত তত্ত্বের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায়শঃই তাহাদের সংখ্যা দশ। দীঘনিকায়ের নবম 'সুত্ত'—'পোট্ঠপাদসুত্তে' সেই দশটি 'অব্যাকত' তত্ত্বের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।[১] যথা—(১-২) এই লোক শাশ্বত অথবা এই লোক অশাশ্বত; (৩-৪) এই লোক অন্তবান্ অথবা এই লোক অনন্তবান্; (৫-৬) জীব এবং শরীর অভিন্ন, অথবা জীব এবং শরীর ভিন্ন; (৭-৮) মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, অথবা থাকে না; (৯) মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে এবং থাকে না; (১০) অথবা, মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব নাও থাকে, নাও-থাকে না।[২] ভগবান্ বুদ্ধদেব যখন ইহার হেতু জিজ্ঞাসিত হইলেন—

"কস্মা ভন্তে ভগবা অব্যাকতন্তি?"

তখন তিনি সেই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন—

"ন হেতং পোট্ঠপাদ অত্তসংহিতং ন ধম্মসংহিতং, ন আদি-ব্রহ্ম চরিয়কং, ন নিব্বিদায়, ন বিরাগায়, ন নিরোধায়, ন নিব্বানায় সংবত্ততি। তস্মা তং ময়া অব্যাকতন্তি॥"

---

১. 'মাধ্যমিকবৃত্তি'তে (পৃ. ৪৪৩) অব্যাকৃতের সংখ্যা চতুর্দশ।

২. মরণের পর 'তথাগতে'র অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব সম্বন্ধে এই বিচার বস্তুতঃ 'আত্মা'র অস্তিত্ব নাস্তিত্বেরই বিচার, অর্থাৎ মরণের পর তথাগতের আত্মা বলিয়া কোনও পদার্থের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে কি না। তুলনীয়: "The real issue therefore is not the existence of Tathagata after death, but whether there is *atta*, and if so, does the *atta* of Arhats or Buddhas remain eternally in *Nirvana* in any form, or become extinct."—Nalinaksa Dutt. নাগার্জুন তাঁহার 'মাধ্যমিক বৃত্তি'র 'তথাগতপরীক্ষা' শীর্ষক দ্বাবিংশ অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন।

পালি 'দীঘ-নিকায়ে'র প্রথম সুত্ত 'ব্রহ্মজাল-সুত্তে' ভগবান্ বুদ্ধ ৬২ প্রকার বিভিন্ন মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেগুলিকে দশটি বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। নিম্নে সেগুলি যথাক্রমে উল্লিখিত হইল—

১. সস্সতবাদ ( সংস্কৃত শাশ্বতবাদ )—৪ প্রকার

২. একচ্চসস্সতবাদ ( সঃ একত : শাশ্বতবাদ )—৪ প্রকার

৩. অন্তানন্তিক—৪ প্রকার[১]

৪. অমরাবিক্খেপিকা[২]—৪ প্রকার

৫. অধিচ্চসমুপ্পন্নিকা[৩]—২ প্রকার

৬. উদ্ধমাঘাতনক-সঞ্ঞিবাদ[৪]—১৬ প্রকার

৭. —অসঞ্ঞিবাদ—৮ প্রকার

৮. —নেবাসঞ্ঞি-নাসঞ্ঞিবাদ—৮ প্রকার

৯ উচ্ছেদবাদ[৫]—৭ প্রকার

এবং ১০. দিট্‌ঠধম্মনিব্বানবাদ[৬]—৫ প্রকার

বুদ্ধদেব এই সকল মতবাদকে 'মিথ্যাদৃষ্টি' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই সকলের মূলে আছে ন্যূনাধিক পরিমাণে 'সৎকায়-দৃষ্টি', দেহাত্মবাদ বা আত্মার প্রকৃত স্বরূপবিষয়ে অজ্ঞান। এই সকল বিষয়ে আলোচনা বুদ্ধদেবের দৃষ্টিতে নিষ্ফল বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। তবে ভগবান্ বুদ্ধের দেশনার লক্ষ্য ছিল কি? ইহার উত্তর বুদ্ধদেব স্বয়ং 'পোট্‌ঠপাদ-সুত্তে' দিয়াছেন। পোট্‌ঠপাদের প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধদেব বলিতেছেন—

"'ইদং দুক্খং'তি পোট্‌ঠপাদ ময়া ব্যাকতং। 'অয়ং দুক্খসমুদয়ো' তি খো পোট্‌ঠপাদ ময়া ব্যাকতং। 'অয়ং দুক্খনিরোধো' তি খো পোঠট্‌পাদ ময়া ব্যাকতং। 'অয়ং দুক্খ-নিরোধ-গামিনী পটিপদা' তি খো পোট্‌ঠপাদ ময়া ব্যাকতং তি।"

দুঃখের স্বরূপ, দুঃখের নিদান, দুঃখের নিবৃত্তি এবং দুঃখনিবৃত্তির উপায়—এই চতুর্বিধ তত্ত্বই ভগবান্ তথাগতের দেশনার মূলীভূত প্রেরণা। উরুবিল্ব গ্রামে সমাহিতচিত্ত তথাগতের 'ধর্মচক্ষুঃ' যখন উন্মীলিত হইল, তখন উপরিউক্ত চতুর্বিধ তত্ত্ব—অর্থাৎ, দুঃখ, সমুদয়, মার্গ এবং বিরোধ, তাঁহার নেত্রের সম্মুখে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিল। বুদ্ধদেব এই চতুর্বিধ

১. জগৎ 'সান্ত' বা 'অনন্ত' এই সম্পর্কে বিচার।

২. অর্থাৎ 'বৈতণ্ডিক' বা Evasive Disputants. "eel-wriggling"...amara—a kind of fish' ...A man who sits on the fence."—P. T. S. Dictionary. পূর্বোক্ত ছয়জন তীর্থকরগণের মধ্যে অন্যতম 'সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্ত' 'অমরা-বিক্খেপিক'রূপে পরিচিত।

৩. সংস্কৃত 'অধৃত্য ( ? )-সমুৎপন্নিকা', (P. T. S. Dictionary ) অর্থাৎ Fortuitous Originists.

৪. আঘাতন=death. উদ্ধ......বাদ—Those who believe in the existence of a conscious soul after death.

৫. Annihilationists. ৬. Theorisers about the attainment of *nibbana* in this life.

তত্ত্বকে 'আর্যসত্য' (Noble Truths) রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। এই জগৎ দুঃখময়, সেই দুঃখের কারণ অবিদ্যা, সেই অবিদ্যার বিনাশে দুঃখের চিরনিবৃত্তি এবং আর্য আষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুশীলন সেই দুঃখনিবৃত্তির একমাত্র উপায়,—এই চতুর্বিধ মহাসত্য ভগবান্ বুদ্ধ মানবসমাজে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। চিকিৎসাশাস্ত্র যেমন চতুর্ধা বিভক্ত—রোগ, রোগহেতু, আরোগ্য এবং ভৈষজ্য, সেইরূপ ভগবান্ বুদ্ধের দেশনারও এই চতুর্বিধ অংশ। কি করিয়া দুঃখব্যাধি-প্রপীড়িত এই সংসারে নির্বাণরূপ আরোগ্য আনয়ন করা যাইতে পারে, ইহাই ছিল শাক্যমুনির তপস্যার ও দেশনার চরম ও পরম লক্ষ্য। তিনি নিজের মোক্ষ কামনা করেন নাই। দুঃখময় সংসারে শান্তি আনয়নের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেইজন্য বৌদ্ধসাহিত্যে শাক্যমুনি 'বৈদ্যরাজ'রূপে অভিহিত হইয়া থাকেন। 'ললিত-বিস্তরে' দেখিতে পাই, সম্বোধি-লাভের পর বুদ্ধদেবকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে—

"উৎপন্নো বৈদ্যরাজঃ প্রমোচকঃ সর্বদুঃখেভ্যঃ, প্রতিষ্ঠাপকো
নির্বাণসুখে, নিষণ্ণস্তথাগতগর্ভে, তথাগতমহাধর্মরাজাসনে।"

আবার বলা হইয়াছে—

"চিরাতুরে জীবলোকে ক্লেশব্যধিপ্রপীড়িতে।
বৈদ্যরাট্ ত্বং সমুৎপন্নঃ সর্বব্যাধিপ্রমোচক:॥"

'যোগসূত্রে'র ব্যাসভাষ্যেও যোগশাস্ত্রকে চিকিৎসাশাস্ত্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। চিকিৎসাশাস্ত্র যেমন চতুর্ব্যূহ, সেইরূপ যোগশাস্ত্রও চতুর্ব্যূহ। ইহাতে দুঃখের স্বরূপ, দুঃখের নিদান, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি, এবং সেই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির উপায় আলোচিত হইয়াছে—

"যথা চিকিৎসাশাস্ত্রং চতুর্ব্যূহম্—রোগো রোগহেতুরারোগ্যং ভৈষজ্যমিতি, এবমিদমপি শাস্ত্রং চতুর্ব্যূহমেব। তদ্‌যথা—সংসারঃ সংসারহেতুঃ মোক্ষো মোক্ষোপায় ইতি। তত্র দুঃখবহুলঃ সংসারো হেয়ং। প্রধানপুরুষয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ। সংযোগস্যাত্যন্তিকী নিবৃত্তির্হানম্। হানোপায়ঃ সম্যগ্‌দর্শনম্।"[১]

শুধু বৌদ্ধদর্শনেই নহে, ভারতীয় প্রত্যেক দার্শনিক প্রস্থানেই এই সংসারকে দুঃখময়রূপে পরিগণনা করা হইয়াছে, এবং সেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মানবের পরমপুরুষার্থরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। 'সাংখ্যকারিকা'র প্রারম্ভেই ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদপঘাতকে হেতৌ"

এই জগৎ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, এবং আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ দুঃখের আধার। এবং যাঁহারা বিবেকী, তাঁহারা সেই ত্রিবিধ দুঃখ পরিহারের উপায় অন্বেষণেই নিয়ত ব্যাপৃত থাকেন। 'যোগসূত্র'কার মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

"পরিণাম-তাপ-সংস্কার-দুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ
দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ॥"—যো. সূ. ২।১৫

১. যোগসূত্র, ২।১৫ ভাষ্য।

বিবেকী পুরুষের নিকট সকলই দুঃখময়। 'ন্যায়সূত্র'কার মহর্ষি গোতম বলিয়েছেন—

"দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে
তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।"—ন্যা. সূ. ১।১।২

মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যামূলক যে দুঃখ, তাহার উচ্ছেদেই অপবর্গ বা নিঃশ্রেয়সলাভ সম্ভব হইয়া থাকে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বৌদ্ধদর্শনের এই দুঃখবাদ ভারতীয় আর্য দার্শনিক মতবাদের মূল ভিত্তিস্বরূপ। উপনিষদের প্রবক্তা যোগিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধদেব, মহাবীর, শঙ্কর প্রভৃতি সকল দার্শনিক মনীষীই এই জগতের দুঃখময়তা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কেহই এই জগৎকে সুখময় ও নিত্যরূপে কল্পনা করেন নাই। অবিদ্যাবগুণ্ঠিত সাধারণ মানব এই দুঃখকেই সুখ মনে করিয়া সংসারে আসক্ত হইয়া রহিয়াছে। 'স্বর্গসুধা-মহাহ্রদে'র অন্তরেও 'দুঃখবহ্নিকণিকা' গুপ্ত হইয়া আছে। আমরা অবিদ্যাবশে তাহা বুঝিতেছি না। মধুলোভে লুব্ধ হইয়া আমরা প্রপাত লক্ষ্য করিতেছি না। কিন্তু যে সকল মহাপুরুষ লোকশিক্ষার জন্য, জগতের উপকারের জন্য মানবজন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারা এই জড় জগতের আপাতরমণীয়তার অন্তরালে ঐকান্তিক দুঃখের সত্তা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। ঐহিক বা পারলৌকিক কোনও সুখের প্রলোভনেই তাঁহারা প্রকৃত তত্ত্ব জগতের দুঃখময়ত্ব বিস্মৃত হন না। ঐহিক এবং আমুষ্মিক সকল সুখই তাঁহাদের দৃষ্টিতে দুঃখরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। সাধারণ মানব যে সুখের দিকে উন্মত্তের মত ধাবিত হইয়া থাকে, মুমুক্ষু বিদ্বান্ যোগিগণ তাহারই পরিণামবিরসতা চিন্তা করিয়া তাহা হইতে স্বতই বিরত হইয়া থাকেন। এই অনাদি দুঃখস্রোতের অভিজ্ঞতা যোগিগণকেই কেন উদ্বিগ্ন করিয়া থাকে, বিষয়াসক্ত-চিত্ত সাধারণ মানব সহস্র দুঃখের অভিঘাত সহ্য করিয়াও কেন পীড়িত হয় না, এই জিজ্ঞাসার সমাধান নির্দেশ করিতে গিয়া 'যোগসূত্রে'র ভাষ্যকার মহর্ষি ব্যাস একটি সুন্দর উপমা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"এবমিদমনাদি দুঃখস্রোতো বিপ্রসৃতং যোগিনমেব প্রতিকূলাত্মকত্বাদুদ্বেজয়তি। কস্মাৎ। অক্ষিপাত্রকল্পো হি বিদ্বানিতি। যথা ঊর্ণাতন্তুরক্ষিপাত্রে ন্যস্তঃ স্পর্শেন দুঃখয়তি ন চান্যেষু গাত্রাবয়বেষু। এবমেতানি দুঃখানি অক্ষিপাত্রকল্পং যোগিনমেব ক্লিশ্নন্তি নেতরং প্রতিপত্তারম্ …তদেবমনাদিনা দুঃখস্রোতসা ব্যুহ্যমানমাত্মানং ভূতগ্রামং চ দৃষ্ট্বা যোগী সর্বদুঃখক্ষয়কারণং সম্যগ্‌দর্শনং শরণং প্রপদ্যত ইতি॥"[১]

ঊর্ণাতন্তুর (অর্থাৎ মেষাদি-লোমের কণা) স্পর্শমাত্রে যেমন অক্ষিগোলক ব্যথিত হইয়া উঠে, কিন্তু দেহের অন্যান্য অবয়ব কঠিন আঘাতেও যেমন পীড়িত হয় না, সেইরূপ এই অনাদি দুঃখপরম্পরার অভিঘাতে যোগিচিত্তই ব্যথিত হইয়া থাকে, বিমূঢ় প্রাকৃত জন শত দুঃখের অভিঘাতেও পীড়া অনুভব করিতে পারে না। মহাপুরুষগণ 'লোকচক্ষুঃ'স্বরূপ, সুতরাং তাঁহারাই জগতের দুঃখময়তা উপলব্ধি করিয়া থাকেন, সাধারণ মানব নহে।

---

১. যো. সূ. ব্যাসভাষ্য ২।১৫

তবে বৌদ্ধদর্শনের সহিত অন্যান্য আর্যদর্শনের প্রভেদ কোথায়? প্রভেদ প্রস্থানে। এই প্রস্থানভেদবশতই সকল দর্শনের মধ্যে পরস্পর ভেদ, নতুবা লক্ষ্য একই।

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।"—( মহিম্নঃস্তোত্র )

সাংখ্যমতে জড় ও চৈতন্যের, প্রকৃতি ( Matter ) ও পুরুষের ( Spirit ) মধ্যে প্রসংখ্যান বা বিবেকই এই দুঃখনিবৃত্তির উপায়। বেদান্তমতে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে অভেদবোধ, 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যার্থে যথাযথ উপলব্ধিই জাগতিক সকল দুঃখনিরোধের একমাত্র মার্গ। ন্যায়মতে প্রমাণাদি ষোড়শবিধ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান বা যথার্থজ্ঞানই দুঃখনিবৃত্তি বা অপবর্গের একমাত্র উপায়। বৌদ্ধমতে আর্য আষ্টাঙ্গিক মার্গের ( Noble Eight-fold Path ) অনুশীলনেই নির্বাণরূপ পরমা শান্তি লাভ করিতে পারা যায়। এই আষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুশীলনই ভগবান্ তথাগত কর্তৃক 'দুক্খ-নিরোধ-গামিনী পটিপদা'রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

দার্শনিক তত্ত্ব—যাহা শুধু সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির দ্বারা অধিগম্য, তাহা প্রচার করা বুদ্ধদেবের মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল না। বুদ্ধদেবের দেশনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল—মানবজীবনে দুঃখের ভার লঘু করিয়া, তাহার মধ্যে শক্তির সঞ্চার করা এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের উপায় নির্দেশ করা। সুতরাং বৌদ্ধধর্মের প্রাথমিক পর্যায়ে দর্শন হইতে নীতির ( ব্যক্তিগত ও সামাজিক ) কথাই মুখ্যভাবে পর্যালোচিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম প্রধানতঃ ethical, ইহার দার্শনিক অংশ বা Philosophy পরবর্তী বৌদ্ধ আচার্যগণের মনীষা ও বিচারবুদ্ধির দান। বুদ্ধদেবের দেশনার প্রাথমিক পর্যায়ে 'ধর্ম' ( Ethics ), তাহা হইতেই পরবর্তী কালের 'অভিধর্ম' ( Metaphysics ) গড়িয়া উঠিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলেই ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইবে। এ বিষয়ে একজন প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

> "Primitive Buddhism was much more a simple religious and ethical code than a metaphysical attempt to solve the problems of the Universe, but as time elapsed and later commentators, delighting in subtlety, strove to further truth and enhance their own reputations by applying the old formulae to a rational explanation of the whole universe, the old Dharma was supplemented by a new Abhidharma...."[১]

প্রাচীন বৌদ্ধধর্মে শুধু ব্যক্তিগত নির্বাণলাভের পথই নির্দিষ্ট হয় নাই, সমষ্টিগত কল্যাণ লাভের উপায়ও নির্দেশ করা হইয়াছে। বুদ্ধদেব স্বয়ং ব্যক্তিগত নির্বাণ বা মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষার দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তপস্যার দ্বারা স্বকীয়

---

১. Mc Govern, *Manual of Buddhist Philosophy*, pp. 1-2.

শরীর শোষণ করিয়া, সকল দুঃখের নিদানভূত চিত্তকে সংযত ও নিগৃহীত করিবার জন্য তৎপর হইয়াছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ ছয় বৎসর এই শরীরনিগ্রহের পথে অগ্রসর হইয়া তিনি ব্যর্থমনোরথ হইয়া বিরত হইলেন, শরীর নিগ্রহের পথ ত্যাগ করিয়া 'মধ্যমা প্রতিপদা' বা মধ্যম মার্গ আশ্রয় করিলেন—এই মার্গ 'নেতিমূলক' নহে ; সকল জীবের প্রতি, আব্রহ্মস্তম্ব সর্বজাতীয় সৃষ্টির প্রতি মৈত্রী করুণা মুদিতা ও উপেক্ষা পোষণ করতঃ তিনি নিজ চিত্তকে পরিশোধন করিতে লাগিলেন। 'দিব্যাবদানে' একটি শ্লোকে বুদ্ধদেবের সেই চিরাচরিত আত্মনিগ্রহের পথ ত্যাগ করতঃ 'মধ্যমা প্রতিপদা' অবলম্বনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে :—

"ষড়্‌বর্ষাণি হি কটুকং তপস্তপ্ত্বা মহামুনিঃ।
নায়ং মার্গো হ্যভিজ্ঞায় ইতি জ্ঞাত্বা সমুৎসৃজৎ ॥"[১]

কিন্তু বুদ্ধদেবের এই দেশনা ভারতীয় সভ্যতায় যে সর্বপ্রথম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা নহে। বুদ্ধদেব প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক ও নৈতিক চিন্তাধারা হইতেই তাঁহার দেশনার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব কর্তৃক প্রচারিত চতুর্বিধ 'আর্যসত্য', দ্বাদশবিধ 'নিদান', মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষাত্মক 'পরিকর্ম', সকলই ভারতীয় দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বুদ্ধদেব শুধু নিপুণভাবে বিভিন্ন দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক প্রস্থান হইতে সেই সেই অংশ নির্বাচন করিয়া একটি সুসম্বদ্ধ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ 'দেশনা' প্রবর্তন করেন—ইহাই তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব। বুদ্ধদেব আর্য বর্ণাশ্রমধর্মের যে সকল দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক উপদেশ খণ্ডন করিয়াছেন, সে সকল অতি নিম্নস্তরের অধিকারীদের জন্যই বিহিত, ইহা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও অধ্যাত্মসাধনার সহিত যাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, তিনিই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। বৈদিক আর্যপ্রস্থানের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, ইহাতে অধিকারিভেদে বিভিন্ন পথ নির্দিষ্ট হইয়াছে। নিম্নস্তরের অধিকারীর পক্ষে স্থূল ধর্ম ও স্থূল অধ্যাত্মসাধনাই বিহিত হইয়াছে। বুদ্ধদেব শুধু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সেই স্থূলতম অংশেরই খণ্ডন করিয়াছেন। উন্নত অধিকারীর পক্ষে প্রযোজ্য অধ্যাত্ম-সাধনার সূক্ষ্মতম দিক্‌ বুদ্ধদেবের বিচারদৃষ্টি হইতে, যে কোনও কারণেই হউক, এড়াইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সেই উন্নত, সূক্ষ্মতম দেশনার সহিত ভগবান্‌ তথাগতের ধর্মদেশনার কোনও বিরোধই যে নাই, ইহা উভয় প্রস্থান আলোচনা করিলেই বুঝা যায়।

---

১. দিব্যাবদান, পৃ. ৩৩২

# বেথুন সোসাইটি

## ষষ্ঠ প্রস্তাব

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

প্রতিষ্ঠাবধি বার বৎসর যাবৎ বেথুন সোসাইটির মাধ্যমে ইউরোপীয় ও বাঙালী মনীষীগণ সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, ললিতকলা, সমাজ-তত্ত্ব, কৃষি-শিল্প ও বিবিধ বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনার দ্বারা ভারতবর্ষের উন্নতি-চিন্তায় রত ছিলেন। ইহার পরিচয় আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে পাইয়াছি। ড. আলেকজাণ্ডার ডাফ সোসাইটির সভাপতি পদে বৃত হইবার পর ইহার কার্য্য কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত হয়। ইংরেজ-বাঙালী বিদগ্ধজন এই সকল বিভাগেই সাধারণ শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, সাহিত্যাদি সমাজোন্নতি বিষয়ক আলোচনা-গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভারত-ত্যাগের (এপ্রিল, ১৮৬৩) পূর্ব্বেই বিভাগীয় কার্য্যে একরূপ ভাটা পড়িয়া যায়। ডাফের ভারত-ত্যাগের কয়েক মাস পরে পাদ্রী জোসেফ মুলেন্‌স বেথুন সোসাইটির সভাপতি হইলেন। খ্রীষ্টান পাদ্রীগণের অনেকেই যে ভারত-বন্ধু, পূর্ব্ববর্ত্তী নীল-আন্দোলন কালে তাঁহাদের দ্বারা প্রজাকুলের সপক্ষতা করায় তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মুলেন্‌স সত্য সত্যই প্রজা-দরদী ভারত-হিতৈষী ছিলেন। ভারতবর্ষের উন্নতিসাধনে ইউরোপীয়দেরও যে বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে, একথা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন। এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে তাঁহার পত্নী হানা ক্যাথেরিণ মুলেন্‌স বাংলা ভাষা এরূপ আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, তিনি "ফুলমণি ও করুণার বিবরণ" নামে একখানি সুপাঠ্য বাংলা পুস্তক রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন (১৮৫২)। এখানির মধ্যে বাংলা উপন্যাসের ধারা আমরা প্রথম পাই। সম্প্রতি শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে।

ত্রয়োদশ বৎসরে পদার্পণ করিবার পর বেথুন সোসাইটির প্রথম মাসিক অধিবেশন হইল ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ১০ নবেম্বর তারিখে। সভাপতি মুলেন্‌স এই অধিবেশনে যথারীতি একটি প্রারম্ভিক বক্তৃতা করিলেন। এই বক্তৃতায় সম্বৎসরের কার্য্যসূচীর পরিচয় আগে-আগে দেওয়া হইত। মুলেন্‌সও বিভাগীয় কার্য্যসম্বন্ধে একটি কর্ম্মসূচী উত্থাপন করিলেন। সমাজ-বিজ্ঞান, সাহিত্য, স্বাস্থ্য এবং স্ত্রীশিক্ষা—এই চারিটি বিষয়ে অন্ততঃ এ সিজনে একটি করিয়া সভা হইবে। তিনি দিন-তারিখও স্থির করিয়া দিলেন। এই প্রসঙ্গে দুঃখ করিয়া তিনি বলেন যে, ইউরোপের বিদ্বজ্জনসভাগুলিতে সদস্যগণ সক্রিয়ভাবে যোগদান করিয়া থাকেন, সেক্রেটারী বা কর্ম্মসচিব তাঁহাদের কার্য্যকলাপের শুধু সমাহার করিয়াই নিরস্ত থাকেন, পক্ষান্তরে এ দেশের সভা-সমিতিগুলিতে সেক্রেটারীকেই সবকিছু করিতে হয়; সদস্যগণ নিষ্ক্রিয় বা প্রায়-নিষ্ক্রিয় থাকায় ইহাদের বিশেষ উন্নতি হইতে পারে না। বেথুন সোসাইটির কার্য্যবিবরণে দেখা যায়, সভাপতি মুলেন্‌সের প্রস্তাব অনুসারে কোন কাজই

হয় নাই। তবে মাসিক অধিবেশনগুলি রীতিমত হইতেছিল, এবং বিভিন্ন জ্ঞানগর্ভ ও সমাজ-হিতকর বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনাও সুনিয়মে হইতে থাকে। এই অধিবেশনে বক্তৃতা দেন সভাপতি মুলেন্‌স স্বয়ং, তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল—"The Roman Empire" বা রোম-সাম্রাজ্য। সাম্রাজ্যের পতন-কালে তথাকথিত উচ্চ স্তরে দুর্নীতি, অনাচার এবং পাপ-কলুষের দিকে তিনি শ্রোতৃবর্গের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করেন। গথ, এলেম্যান, ভ্যাণ্ডাল ও হুন নামক নানা অসভ্য জাতিরা আসিয়া রোম অধিকার করে। এই সকল তথাকথিত 'অসভ্য' জাতিদের মধ্যে সারল্য, সততা, সামাজিকতা এবং ধর্ম্মবোধ প্রবল ছিল। আর এই সমুদয় গুণই ছিল তাহাদের শক্তির উৎস। মুলেন্‌স ভারতবাসীদের উন্নত অবস্থার সঙ্গে রোমবাসীদের তুলনা করিতেও ভুলেন নাই। এদেশের তথাকথিত 'অসভ্য' আদিবাসীদের সদ্‌গুণাবলীর যথোচিত প্রশংসা করিলেন। বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষের সত্যিকার উন্নতির পক্ষে তাহার অধিবাসীদের মধ্যে সদ্‌গুণাবলীর অনুশীলন বা চর্য্যা একান্ত প্রয়োজন। বক্তা উপসংহারে বলেন—

> "Of all Kingdoms and all generations of men, it is true that our real enemies are our own vices. They are the Huns, and Avars, the Vandals and Goths, the Allemans and Burgundians, who overwhelm us with ruin. If nations would be safe, they must be virtuous, just, truthful, upright; they must themselves be free and give freedom to all their citizens and all their neighbours. Our hope is that India will become increasingly Virtuous and free. That is why she is placed under a foriegn rule. We are all subject to this law, England as well as India. If benefiting by the example, the instructions, the government they enjoy the people of India, grow in virtues, they must grow in power."

সোসাইটির দ্বিতীয় অধিবেশন হইল ২২ ডিসেম্বর ১৮৬৪ দিবসে। এদিনকার মূল বক্তা শিবচন্দ্র নন্দী "Electric Telegraphy in India" শীর্ষক একটি বক্তৃতা প্রদান করেন নানা-রূপ তথ্য ও পরীক্ষণ সহযোগে। বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ সম্পর্কে গবেষণা ও পরীক্ষণ দীর্ঘকাল চলিয়াছিল। কলিকাতার স্থানীয় মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক উইলিয়াম ব্রুক ওসাগনেসি ১৮৪০-৪১ সনে বিদ্যুৎ এবং বিদ্যুতের সাহায্যে বার্ত্তা প্রেরণ বিষয়ে পরীক্ষণ-কার্য্যে লিপ্ত হন। তাঁহার গবেষণার ফলাফল তিনি বড়লাট অকল্যাণ্ড, পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী এবং মান্যগণ্য ইউরোপীয় ও ভারতীয়ের সম্মুখে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভারত সরকার বৈদ্যুতিক তার স্থাপনের সংকল্প করিয়া ওসাগনেসিকেই পঞ্চম দশক নাগাদ ডিরেক্টর বা অধ্যক্ষপদে নিয়োগ করেন। প্রথমে উত্তর ভারতে এবং পরে দক্ষিণ ভারতে বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ বা তার স্থাপনের আয়োজন হইল। রেঙ্গুন-পতনের সংবাদ সর্ব্বপ্রথম বৈদ্যুতিক তার যোগেই পরিবেশিত হয় ১৮৫২ সনের ১৯শে এপ্রিল। বড়লাট ডালহৌসী ওসাগনেসিকে ইহার পর বিলাতে পাঠান, এই বিষয়ে কোম্পানীর ডিরেক্টর-সভাকে বিশেষভাবে অবহিত করার নিমিত্ত। ওসাগনেসি বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষকে বৈদ্যুতিক তারের গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত করাইতে সমর্থ হইলেন এবং সরকারী অর্থে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। সিপাহী যুদ্ধে ব্রিটিশ জাতি যে জয়যুক্ত হয় তাহার মূলে

উত্তর ভারতের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বৈদ্যুতিক তারে সংবাদ আদানপ্রদানের ব্যবস্থা কম কার্য্য করে নাই। শিবচন্দ্র নন্দী বৈদ্যুতিক তার বিভাগে ওসাগনেসির সহকর্মী হইলেন। তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বৈদ্যুতিক তার বিভাগের সার্থকতা প্রতিপন্ন করেন। কিরূপে একস্থান হইতে অন্য স্থানে সংবাদ প্রেরণ করা হয়, তাহা, পোষ্ট, তার ও যন্ত্রপাতির সহযোগে তিনি উপস্থিত জনগণকে দেখাইলেন। টেলিগ্রাফের সাংকেতিক ভাষা বা অক্ষরের ক্রমিক বিকাশ সম্বন্ধেও তিনি বক্তৃতায় বলিলেন। টেলিগ্রাফে সংবাদ প্রেরণ বিষয়ে কাহারও কাহারও কৌতুককর অজ্ঞতার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। একদিন ভারতবর্ষের একটি টেলিগ্রাফ-কেন্দ্রে জনৈক ইউরোপীয় মহিলা তারে 'চিঠি' পাঠাইবার জন্য উপস্থিত হন, অনেক বলিয়া কহিয়া তবে তাঁহাকে নিরস্ত করিতে হয়।

সোসাইটির তৃতীয় অধিবেশন হইল ১২ই জানুয়ারী ১৮৬৫ তারিখে। এই দিবসের বক্তা ছিলেন সুবিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেন, বক্তৃতার বিষয়—"On a Visit to Madras and Bombay with Notes of differences between their customs with those of Bengal।" কেশবচন্দ্র ইতিপূর্ব্বে মান্দ্রাজ ও বোম্বাই পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। মাদ্রাজীদের রক্ষণশীলতা এবং বোম্বাইবাসী পার্শীদের ব্যবসায় বুদ্ধি তাঁহাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। যেমন নাম হইতে বুঝা যায়, বক্তা বাঙালী, মান্দ্রাজী এবং পার্শীদের কাজ-কর্ম রীতিনীতি এবং আচার-আচরণের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া এ তিনের বৈশিষ্ট্যের প্রতি সোসাইটির সদস্যদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিলেন। প্রত্যেকটি প্রদেশবাসীর উন্নতিকল্পে যেমন কতকগুলি বিষয়ের সংস্কারসাধন প্রয়োজন তেমনি সমগ্র দেশের উন্নতির নিমিত্ত ও ইহাদের মধ্যে যে-সব বিশেষ বিশেষ গুণ রহিয়াছে তাহার উৎকর্ষসাধন আবশ্যক। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় অংশবিশেষের এই কথাগুলি বলা হয়—

> "The Lecturer then proceeded to discuss the question, which a comparative view of native society in the three Presidencies, had suggested to his mind, namely, the mission, which each was destined to fulfil in the great future of India. The mission of Bombay seemed to him to be the promotion of the material prosperity of India, her activity and enterprise, and her first-rate bussines habits and talents rendering her peculiarly qualified for that great task. Madras, he thought, would, from her conservatism and orthodoxy, effectively prevent the introduction of foreign fashions into the country, and guard her against inroads on the purity of her national institutions, and primitive manners. The mission of Bengal was the promotion of intellectual and political prosperity."

কেশবচন্দ্রের এই গুরুত্বপূর্ণ ভাষণের পর আলোচনা সুরু হইল এবং তাহাতে যোগদান করিলেন অমৃতলাল ঘোষ, পাদ্রী ড্যাল এবং সভাপতি মুলেন্স স্বয়ং। পাদ্রী ড্যাল বলেন যে, বিভিন্ন দেশ পর্য্যটন শিক্ষার এক বিশিষ্ট অঙ্গ। বক্তার মত কেহ যদি মার্কিণ দেশে যান এবং সেখানে স্বদেশের এবং ঐ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনায় রত হন তাহা হইলে আমরা কম লাভবান হইব না। সভাপতি মুলেন্স বক্তার কোন কোন মন্তব্যের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, প্রত্যেক সমাজেই দোষত্রুটি লক্ষিত হয়, একটি বিষয় আলোচনাকালে অন্যটির কথাও আমাদের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। মোট কথা প্রত্যেক প্রদেশবাসীর

সামাজিক দোষত্রুটি পরিহারপূর্ব্বক স্বদেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্য আমাদের অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য।

সোসাইটির চতুর্থ মাসিক অধিবেশন হয় ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬৫ দিবসে। এই দিনের বক্তা ছিলেন—রাজেন্দ্রলাল মিত্র। বক্তৃতার বিষয়—"On writing in Ancient India and the Sanskrit Alphabet।" রাজেন্দ্রলাল সমাজকর্ম্মী, সুপণ্ডিত ব্যক্তি, এবং পুরাতত্ত্বের আলোচনায় ইতিমধ্যেই তিনি সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার নিমিত্ত বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সোসাইটির এ অধিবেশনে উপস্থিত হন। রাজেন্দ্রলাল বক্তৃতায় প্রথমেই ইংলণ্ডস্থিত দুই জন প্রধান সংস্কৃত-অধ্যাপকের মতামত উদ্ধৃত করেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার ভারতের প্রাচীন লিপি খ্রীষ্টপূর্ব্ব চারিশত বৎসরের অধিক পুরনো নয় এইরূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে পাণিনির সময় হইতেই এ দেশে লিখন আরম্ভ হয়। অধ্যাপক গোল্ডস্টুকার এই মতের ঘোর বিরোধী। তিনি ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে গ্রন্থাদিদৃষ্টে এবং পাণিনির সূত্রাদি বিবেচনায় প্রাচীন লিপি যে খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্দ্দশ শতকের ঢের পূর্ব্বেকার তাহা বিশেষভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। রাজেন্দ্রলাল বক্তৃতায় শেষোক্ত মত সমর্থন করেন এবং সমর্থনকালে তিনি আরও বিস্তর তথ্য-প্রমাণ উদ্ধৃত করিলেন।

সংস্কৃত বর্ণমালার স্বকীয়তা প্রমাণ করিয়া তিনি বলেন যে, ইহা সত্য সত্যই বিজ্ঞানসম্মত এবং ইহা কাহারও নিকট হইতে ধার করা জিনিস নয়। এই বর্ণমালা ভারতের বিবিধ স্থানিক ভাষায়ও গৃহীত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রবর্ত্তিত বর্ণমালায় ( যেমন, ँ চন্দ্রবিন্দু ইত্যাদি ) বিরূপ সমালোচনা করিতেও ছাড়েন নাই। তিনি প্রাচীন সংস্কৃত বর্ণমালা হইতে আধুনিক বর্ণমালার ক্রমিক বিকাশ একটি চার্টে উপস্থিত সভ্যগণকে দেখাইলেন। বর্ণমালার আলোচনাপ্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল এদেশে রোমান হরফ চালাইবার প্রচেষ্টার বিষয় উল্লেখ করেন। তৃতীয় দশকে এই বিষয়ে বাংলা দেশে বেশ একটি আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। সংবাদপত্রে রোমান হরফ প্রবর্ত্তনের সপক্ষে ও বিপক্ষে আলোচনা-বিতর্কও চলে খুবই। সিবিলিয়ান সি. ই. ট্রেভেলিয়ান রোমান হরফে একখানি বাংলা বই ছাপাইয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা ঐ প্রচেষ্টার অসারতা প্রতিপাদন করেন। নিজস্ব সংস্কৃত বর্ণমালার সঙ্গে ধর্ম্মীয় যোগাযোগের কথাও তিনি উল্লেখ করিলেন। উপসংহারে রাজেন্দ্রলাল বলেন যে, পুরাতত্ত্বের সম্যক্ আলোচনা দ্বারা আমরা অতীত গৌরবগাথার সঙ্গে পরিচিত হই এবং ইহা আমাদিগকে নূতন করিয়া কর্ম্মে লিপ্ত হইতে অনুপ্রেরণা যোগায়। তিনি স্বদেশীয় যুবকগণকে উদ্দেশ করিয়া বলেন—

> "The Lecturer concluded by a warm exhortation to the rising genration of his country to rise from their slumbers, and shake of the lethargy which sat like an in cubus upon their energies, and shew to the world that they had not in vain inherited the intellect of the primitive civilizers of the human race, and to keep in mind the principles and progress of Western nations, which have raised them to a desevedly exalted position in civilization.

বক্তৃতা অন্তে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, পাদ্রী ড্যাল সভাপতি মুলেন্‌স আলোচনায় যোগ দিলেন। লালবিহারী বলেন যে, উচ্চারণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বিদ্যাসাগর বর্ণমালার সংস্কারসাধন করিয়াছেন, এ কারণ তাঁহার দোষ দেওয়া যায় না। ড্যালের মতে একটি "Phonetic Alphabet" বা উচ্চারণমাফিক বর্ণমালার উদ্ভব করিতে পারিলে সব সমস্যার সমাধান হয়। তিনি সুধীবর্গের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিলেন। সভাপতি বক্তাকে ধন্যবাদ-দানকালে বলেন যে, হিব্রু বর্ণমালার উদ্ভব হয় বিভিন্ন বস্তু ও জীবের আকার হইতে; যেমন—'আলেফ' অক্ষরটির আকার—বৃষের মস্তক, 'বে'র আকার—ঘর। ভাষাতত্ত্বের আলোচনা যে কত চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে, ঐ দিনকার সাধারণ সভায় তাহা প্রথম লক্ষ্য করা গিয়াছে।

পঞ্চম অধিবেশনে "Heat" ( উত্তাপ ) সম্পর্কে বক্তৃতা দেন ড. ম্যালকনামারা। বিবিধ পরীক্ষণ ( 'experiments' ) সাহায্যে সভ্যগণকে তিনি পদার্থবিদ্যার এই বিশেষ বিষয়টি সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে ড. রব্‌সন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সোসাইটির ষষ্ঠ বা শেষ অধিবেশনের পূর্ব্বে ইহার একটি বিশেষ অধিবেশন হইল ৫ই এপ্রিল ( ১৮৬৫ ) দিবসে। এই অধিবেশনে মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ 'Periodical Census' শীর্ষে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করিলেন। পরবর্ত্তী ১৮৭১ সন নাগাদ ভারতবর্ষে সেন্সাস গ্রহণের যে আয়োজন হয় তৎসম্বন্ধে আলোচনা কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই বিভিন্ন বিদ্বজ্জনসভায় হইতে থাকে। বেথুন সোসাইটিতেও এইরূপ আলোচনার সূত্রপাত হইল মৌলবী আবদুল লতিফের বক্তৃতা হইতে। মৌলবী আবদুল লতিফ বাঙালী তথা ভারতীয় জীবনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিষয় জানিবার জন্য সেন্সাসের আবশ্যকতা যে কত, তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। বাংলার নর-নারী-শিশু, গৃহপালিত জীবজন্তু, কৃষি-শিল্প, শিক্ষা-সংস্কৃতি সব বিষয়েই একটি তথ্যমূলক পরিসংখ্যান থাকা প্রয়োজন। সরকারের পক্ষে তো ইহা অত্যাবশ্যকই। তিনি বক্তৃতায় আরও বলেন যে, তাঁহার নিজ মুসলমান সমাজ ইহা দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হইবে। মুসলমান সমাজে অন্ধ, খঞ্জ, কালা, বোবা প্রভৃতি দুর্গত ও দুঃস্থ লোকের নিরতিশয় প্রাচুর্য্য। তাহাদের পরিসংখ্যান না থাকায় সরকারী কি বেসরকারী কোনরূপ সাহায্য দানেরও ব্যবস্থা হইতে পারিতেছে না। আবদুল লতিফ নানা দিক দিয়াই সেন্সাস লওয়ার আবশ্যকতা শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

সোসাইটির ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন হইল পরবর্ত্তী ১১ই এপ্রিল। এই দিনে বক্তৃতা করেন মেজর জি. বি. ম্যালেসন। ড. মুলেন্‌সের পরে ম্যালেসন সোসাইটির সভাপতি হন। তাঁহার কথা পরে কিছু বলা যাইবে। ম্যালেসনের বক্তৃতার বিষয় হইল—"Disraeli's Literary and Political Career"। গত শতাব্দীর শেষার্দ্ধে গ্লাডষ্টোন ও ডিস্‌রেলীর নাম রাজনীতির কথা আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রত্যেকেরই স্বতঃই মনে থাকিবে। ডিস্‌রেলী

অতি সামান্য অবস্থা হইতে নিজ অধ্যবসায় বলে গ্রেট ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন একাধিকবার। ডিস্‌রেলী যে সাহিত্যসেবীও ছিলেন একথা হয়ত অনেকের জানা নাই। মেজর ম্যালেসন বক্তৃতায় তাঁহার সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক জীবন—এই উভয় দিক সম্বন্ধেই আলোচনা করিলেন।

২

বেথুন সোসাইটি চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিল (১৮৬৫-৬৬)। সোসাইটির বিভাগগুলির কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, পূর্ব্বেই আমরা তাহা দেখিয়াছি। আগেকার নিয়ম অনুযায়ী প্রতি বৎসরে অবশ্য ছয়টি করিয়া মাসিক অধিবেশন হইতে লাগিল। তবে মাসিক অধিবেশন ব্যতিরেকে, সোসাইটির বিশেষ অধিবেশনও কোন কোন সময় অনুষ্ঠিত হইত এবং বিশিষ্ট বক্তা বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বা উপলক্ষ্যে বক্তৃতা প্রদান করিতেন। সোসাইটির বৈষয়িক কার্য্যাদি নির্ব্বাচনের জন্য একটি কৌন্সিল বা অধ্যক্ষ-সভা ছিল। সোসাইটির প্রতিষ্ঠাবধি প্রতি বৎসর অধ্যক্ষসভার সদস্য সভাপতি সম্পাদক কোষাধ্যক্ষ সাধারণ সভায় নির্ব্বাচিত হইতেন। ডক্টর ডাফের সভাপতিত্ব-কালে অধ্যক্ষ-সভা গঠনের কতকটা রকমফের হইলেও ইহার অস্তিত্ব বরাবরই ছিল। তবে দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বর্ষ হইতে প্রতি বৎসরই যে ইহার অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হইত তাহা সঠিক বলা যায় না। কেননা সোসাইটির কার্য্যবিবরণ-পুস্তকে বাৎসরিক অধ্যক্ষ-সভা গঠনের উল্লেখ পাই না। দুই বৎসর, তিন বৎসর বা ততোধিক কাল পর পর নূতন সভাপতি নিয়োগের কথা আমরা জানিতে পারিতেছি। এই সময় বরাবর সম্পাদক ছিলেন সুবিদ্বান্ কৈলাসচন্দ্র বসু। হরমোহন চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘকাল সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।

চতুর্দ্দশ বৎসরে প্রথম মাসিক সভা হইল ১৮৬৫ সনের ৯ই নবেম্বর। ডক্টর মুলেন্‌স দুই বৎসর যাবৎ সোসাইটির সভাপতি-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার অন্যত্র গমন হেতু তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয়। এই দিনকার সভায় প্রথমে সভাপতিত্ব করেন ড° রবসন। তিনি সদস্যগণকে জানান যে, অধ্যক্ষ-সভার অনুরোধে মেজর জি. বি. ম্যালেসন সোসাইটির সভাপতির পদ গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন। এই কথা সভায় বিজ্ঞাপিত হইলে ম্যালেসন সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হন। ম্যালেসন দীর্ঘকাল ভারতে অবস্থান করিয়াছেন এবং ভারতীয় জীবন সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞানও জন্মিয়াছে। ভারতবাসীর হিতসাধন ছিল তাঁহার একটি প্রধান লক্ষ্য। ঐতিহাসিক রূপেও তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থগুলি তাঁহার অনুসন্ধিৎসা এবং তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় বহন করিতেছে। তাঁহাকে সভাপতিরূপে পাইয়া সোসাইটি বিশেষ লাভবানই হইল। একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, মাসিক অধিবেশনগুলি সোসাইটির সাধারণ সভাও বটে।

এই দিনকার বক্তা ছিলেন নব-নির্ব্বাচিত সভাপতি ম্যালেসন স্বয়ং। তাঁহার বক্তৃতার বিষয়

ছিল,—"Florence Nigtingale and her life of self-denial and loving care of others।" এই মহীয়সী মহিলার মানব-হিতৈষণা সর্ব্বজনবিদিত। ইংরেজ নরনারীর চিত্ত তিনি বিশেষ ভাবে জয় করিয়া লন। কবি টেনিসন "Lady with the Lamp" কবিতায় ইঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন। একথা হয়ত অনেকে জানেন না যে, তাঁহার দরদী মন ভারতবাসীদের দুঃখ-দুর্দ্দশায় অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া উঠিত। বাংলাদেশে তখন ম্যালেরিয়া মহামারীর খুবই প্রকোপ। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল এ বিষয়ে খুঁটিনাটি তথ্য পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিতে হইলে উপযুক্ত সেচ-ব্যবস্থার আশু প্রয়োজন। নাইটিঙ্গেল সম্পর্কে ম্যালেসনের মনোজ্ঞ ভাষণটি সভ্যদের আত্ম-জিজ্ঞাসার উদ্রেক করে। ম্যালেসনের বক্তৃতার পর রেভারেণ্ড লালবিহারী দে বলেন যে, ছোটখাট আকারে নাইটিঙ্গেলের মত পরহিতব্রতী মহিলা বাংলা দেশেও খোঁজ করিলে মিলিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি পাবনার বামাসুন্দরী দেবীর কথা উল্লেখ করেন। সেখানকার একটি বালিকা বিদ্যালয়ের তিনি সেক্রেটারী। তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব তিনি এই বিদ্যালয়ের নিমিত্ত দান করিয়াছেন।

সোসাইটির দ্বিতীয় সাধারণ মাসিক অধিবেশন হইল ১৪ই ডিসেম্বর। ম্যালেসন যথারীতি সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। এ অধিবেশনের বক্তা জে. হ্যারিসন। হ্যারিসন ছিলেন পদস্থ সিবিলিয়ান। তিনি ক্রমে কলিকাতা করপোরেশনের চেয়ারম্যান বা কর্ম্মকর্ত্তা হন। সে যুগে তাঁহারই আমলে এবং আগ্রহাতিশয়ে একটি সুদীর্ঘ নূতন রাস্তা নির্ম্মিত হইয়া শিয়ালদহ ও হাওড়া স্টেশনে যাতায়াতের সুযোগ করিয়া দেওয়া হয়। এই নূতন রাস্তার নামকরণ হয় তাঁহার নামে—'হ্যারিসন' রোড। বর্ত্তমানে ইহা 'মহাত্মা গান্ধী রোড' নামে অভিহিত হইয়াছে। হ্যারিসনের বক্তৃতার বিষয় ছিল,—"Lacordaire and his Career in France in connection with the Press and Freedom of Thougt।" নাম হইতেই বক্তৃতার বিষয়বস্তু সুপ্রকট। মুদ্রাযন্ত্রের শৃঙ্খলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার স্বাধীনতার কিরূপে অপহ্নব ঘটে ভারতবাসী শতাব্দী যাবৎ তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে। বিদেশী-রাজার অধীন না হইয়াও, ফ্রান্সের একদিন আমাদের মতই অবস্থা ছিল। বীর ল্যাকরডেয়ার এই বিষয়ে কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন, হ্যারিসন বক্তৃতায় তাহা বিবৃত করিলেন।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে (১৮ই জানুয়ারী ১৮৬৬) জে. কেড-ব্রাউন "Hindu Chivalry" শীর্ষক একটি তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন। নারীজাতির প্রতি হিন্দুদের ব্যবহার—ইহাই ছিল বক্তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। কিরূপে ইংরাজী 'শিভালরি' কথাটির উদ্ভব হয় তাহা বিবৃত করিয়া মধ্যযুগে রাজপুতানার হিন্দুদের নারীজাতির সম্মান রক্ষাকল্পে রাজপুতদের বীরত্ব ও ত্যাগ-স্বীকারের কথা বক্তা বিশদরূপে বর্ণনা করিলেন।

এই সময় সোসাইটির অবস্থা কতকটা খারাপ হইয়া পড়ে। চতুর্থ অধিবেশনে (২২শে ফেব্রুয়ারী ১৮৬৬) সভাপতি ম্যালেসন দুঃখ করিয়া বলিলেন যে, দুইবার স্থগিত রাখার

পর এই দিনকার অধিবেশন ডাকা সম্ভব হইয়াছে। বক্তারও অপ্রতুলতা দেখা দিয়াছে। তিনি স্বল্পকালের মধ্যে একটি বিষয় যাহা স্থির করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহাই এখানে বক্তৃতায় বলিবেন। বক্তৃতাদানের পূর্ব্বে তিনি সভাপতির আসন ত্যাগ করিলে সার্জন-মেজর সি. আর. ফ্রান্সিস সাময়িক ভাবে সভার পৌরোহিত্য করেন। ম্যালেসনের বক্তৃতার বিষয় ছিল—'লর্ড লেক'। লর্ড লেক একজন বিখ্যাত সেনাপতি। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তারে তাঁহার কৃতিত্ব অনেকখানি। ম্যালেসন এ সব বিষয় বর্ণনান্তে আর একটি বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিলেন। লর্ড লেক ভারতীয় সৈন্যগণের অত্যন্ত গুণমুগ্ধ ছিলেন। ইহাদের বীরত্বের প্রশংসায় তিনি ছিলেন পঞ্চমুখ। মধ্যযুগে ভারতীয় রণক্ষেত্রে সেনাপতির মতিভ্রম ঘটিলেও, সাধারণ সৈন্যদের বীরত্ব প্রকাশ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা সকলেই প্রায় একমত। সাধারণ ভারতবাসীর মধ্যে বীরত্বের প্রাচুর্য্য দেখিয়া ব্রিটিশ আমলের প্রথম যুগে লর্ড লেকও খুবই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

সোসাইটির পঞ্চম অধিবেশন হইল—১৮৬৬, ৮ই মার্চ্চ। ম্যালেসন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এ দিনকার বক্তা—বিচারপতি ফিয়ার। তাঁহার পুরা নাম জন বাড ফিয়ার। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি ছিলেন। কিন্তু ইহাই তাঁহার পূর্ণ পরিচয় নহে। তিনি ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ মেলামেশার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। বিবিধ সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ম্যালেসনের পরে তিনি বেথুন সোসাইটির সভাপতি হন, এ বিষয় যথাকালে আমরা জানিতে পারিব। ফিয়ার ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ, কাজেই তাঁহার বক্তৃতাও ছিল ব্যবহার শাস্ত্রের একটি দিক লইয়া, যথা—"English Rules and Evidence in Anglo-Indian Courts of Justice"। মেকলের সময় হইতে এ দেশীয় বিচার-পদ্ধতিকে কিরূপে ইউরোপীয় ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা চলে, এবং দীর্ঘকাল আলাপ-আলোচনা ও সংযোগ-বিয়োগের পর ষষ্ঠ দশকের প্রথমে বিচার-পদ্ধতি নির্ণীত হয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় জীবন সম্পর্কে যাঁহারা কিঞ্চিৎমাত্রও পড়াশুনা করিয়াছেন তাঁহারা একথা জানেন। ভারতীয় বিচারালয়ে এই বিচার-পদ্ধতি প্রবর্তনের বিষয় বক্তা ফিয়ার তাঁহার বক্তৃতায় আলোচনা করিলেন।

চতুর্দ্দশ বৎসরের ষষ্ঠ বা শেষ মাসিক অধিবেশন হইল—৫ই এপ্রিল ১৮৬৬ তারিখে। এই দিনে কে সভাপতির আসনে উপবিষ্ট ছিলেন তাহার স্পষ্ট উল্লেখ পাই না। ম্যালেসন, মনে হয় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাসিক অধিবেশনে সোসাইটির সাধারণ অধিবেশনও বটে, আর এই সভায় প্রয়োজনমত সোসাইটির বৈষয়িক কার্য্যও নিষ্পন্ন হইত; সোসাইটির অন্যতম উৎসাহী সদস্য ডক্টর রবসন সভার আরম্ভেই প্রস্তাব করিলেন যে, ডাফের সভাপতিত্বকালে ১৮৬২ সনে সোসাইটি কর্ত্তৃক যে "Transactions" বা প্রবন্ধ-পুস্তক বাহির হইয়াছিল তাহাই এ ধরণের শেষ গ্রন্থ। সোসাইটিতে পঠিত প্রবন্ধ বা প্রদত্ত বক্তৃতার সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে

কতকগুলি এত গুরুত্বপূর্ণ যে, শীঘ্রই একখানি 'ট্রান্‌জাক্‌শ্যন্‌স' প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। এ নিমিত্ত অর্থেরও বিশেষ প্রয়োজন। বেথুন সোসাইটির ঐ সময়কার অবস্থা কিরূপ তাহা নির্ণয়ের জন্য তিনি একটি কমিটির উপর ভার দিবার প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল। এই কমিটিতে ছিলেন প্রস্তাবক ডক্টর রব্‌সন, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, সার্জ্জন মেজর সি. আর. ফ্রান্সিস, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ এবং সভাপতি।

ষষ্ঠ অধিবেশনের বক্তা ছিলেন কলিকাতার লর্ড বিশপ কটন। কটন সোসাইটির একজন বান্ধব ছিলেন। ইউরোপীয় ও ভারতবাসীদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনে তিনি ছিলেন বিশেষ উৎসাহী। সোসাইটিকে তিনি ইহার একটি বিশিষ্ট মাধ্যম বলিয়া ব্যক্ত করিতেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে দুইবার সোসাইটির সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। দুইটি বক্তৃতাই যেমন ছিল জ্ঞানগর্ভ তেমনি হৃদ্যতায় ভরপূর। তাঁহার এই দিনের বক্তৃতার বিষয় ছিল—"Employment of Women in Religious and Charitable Works" সম্পর্কে। এই বক্তৃতায় তিনি ইউরোপীয় নারীদের ধর্ম্ম ও দাতব্য বিষয়ে যোগাযোগ সম্বন্ধেই বলিয়াছেন। বক্তৃতার ভূমিকায় তিনি বলেন যে, খ্রীষ্টজন্মের পর হইতে এ যাবৎ ধর্ম্মবিষয়ে এবং বিবিধ সামাজিক কর্ম্মে আত্মনিয়োগের কথা বলিবেন বলিয়া যেন অন্য কিছু মনে না করা হয়। প্রাক্‌-পোপ এবং উত্তর-পোপ যুগে বিভিন্ন নারীর অধিকার কিরূপ সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া উনবিংশ শতাব্দীতে নারীজাতি কিরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে সে সম্বন্ধে কটন সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। সোসাইটিতে প্রদত্ত এই বক্তৃতাই লর্ড বিশপ কটনের শেষ বক্তৃতা। এই বৎসরের শেষে তিনি মারা যান। ঐ যুগে শাসক ও শাসিতের মধ্যে পরিবর্দ্ধমান বিভেদকে নিরাকৃত করিবার জন্য সোসাইটির মাধ্যমে কয়েকজন বিশিষ্ট ইউরোপীয় বিশেষ যত্ন লইয়াছিলেন; কটন ছিলেন তাঁহাদের একজন।

# মহারাজ কুম্ভকর্ণ-পরিকল্পিত শ্রীগীতগোবিন্দ প্রবন্ধ

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

নত্বা মতঙ্গভরতপ্রমুখান্ সুগীত-
সঙ্গীতশাস্ত্রনিপুণাঞ্জয়দেববাচাম্।
শ্রীকুম্ভকর্ণনৃপতিবিবৃতিং তনোতি
গানং নিধায় সরসে রসিকপ্রিয়াহ্বাম্ ॥

ভারতের ইতিহাসে যে স্বল্পসংখ্যক শাসনকর্তার নাম কীর্তিগৌরবে উজ্জ্বল হয়ে আছে, মেবারের মহারাণা কুম্ভকর্ণ বা কুম্ভ তাঁদের একজন। তিনি ছিলেন একাধারে বিজয়ী বীর, উপযুক্ত শাসনকর্তা, স্থাপত্যশিল্পবিশারদ, বহুশাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিত, সুরসিক কবি এবং বিচক্ষণ সংগীতজ্ঞ। ১৪৩৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং পঁয়ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। এই রাজত্বকাল যে ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহেই কেটেছে, তা ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই জানেন; কিন্তু এ খবর খুব কম লোকই জানেন যে, তিনি একজন কুশল বীণাবাদক ছিলেন, তাঁকে অভিনবভরতাচার্য বলে সম্মানিত করা হয়েছে। বিপদসংকুল জীবনযাত্রার বিভীষিকা থেকে তিনি যতটা পেরেছেন, নিজেকে রক্ষা করেছেন এবং সেই সব সুযোগে শিল্পকলার চর্চা করেছেন। কবি জয়দেব শ্রীগীতগোবিন্দ রচনা করে এক সময় সারা ভারতে সুরের একটি নূতন ধারা প্রবাহিত করেছিলেন। ক্রমে সেই সুরের পরিচয় গেল হারিয়ে, কেবল কতকগুলি রাগ-তালের নাম তাঁর কাব্যের উপর অঙ্কিত রয়ে গেল। ভারতীয় সংগীতের বিশেষত্ব এইখানে যে, শিল্পীরা মূল সুর হারিয়ে গেলেও নিরস্ত হন না, পুরাতন পদ নিজের সুরে রূপায়িত করেন—তাতে মূল স্রষ্টার সম্মানহানি হয় বলে তাঁরা মনে করেন না। মেবারের মহারাণা কুম্ভকর্ণ জয়দেবের গীতগোবিন্দ পাঠে বিমোহিত হয়েছিলেন। তিনি নিজে ভারতীয় সংগীতের আদর্শ অনুযায়ী এই প্রবন্ধগুলিকে সুরে রূপায়িত করে সংগীতকলায় তাঁর অপূর্ব পারদর্শিতার স্বাক্ষর রেখে গেলেন। বহুদিন হল কুম্ভ-প্রবর্তিত প্রবন্ধগুলির পরিচয়ও হারিয়ে গেছে, তথাপি তাঁর রসিকপ্রিয়া টীকায় এই সংগীতাংশের বিবৃতি থেকে তাঁর চেষ্টার মহত্ত্ব আমরা উপলব্ধি করতে পারি। কুম্ভকর্ণ জয়দেবের কাব্যে নিজস্ব রীতিতে সুর যোজনা করেছেন এবং প্রবন্ধরূপ আরোপ করেছেন ব'লে তিনি জয়দেব-প্রদত্ত গীতরূপকে লঘু প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন, এমন মনে করবার কোন কারণ নেই। বরঞ্চ উপযুক্ত গাতার অভাবে যে গীত তার পূর্বগৌরব থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল, তাকে তিনি স্বীয় আসনে স্থাপন করবারই প্রয়াসী হয়েছিলেন। জয়দেবের প্রতি এটি তাঁর শ্রদ্ধারই নিদর্শন, ঈর্ষার নয়। গীতগোবিন্দের রসিকপ্রিয়া নামক যে টীকা তিনি প্রণয়ন করেছিলেন, সেটি অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে রচিত এবং তার মূল্য অসাধারণ। এই টীকায় তাঁর নিজস্ব সংগীতাংশের যে বর্ণনা আছে, সেটি থেকেও বোঝা যায়, গীতগোবিন্দের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখবার

জন্য কত যত্ন এবং চিন্তাপূর্বক সেকালকার বিশিষ্ট প্রবন্ধগুলি তিনি এই গীতিকাব্যে সংযোজিত করেছেন।

রসিকপ্রিয়া টীকার প্রারম্ভে তিনি বলছেন—শ্রীগীতগোবিন্দস্য গীতকস্য নব্যাকৃতি-মাতনোতি। তার পর বলছেন—

অতঃ স্বরাদিভিঃ ষড় ভিরঙ্গৈঃ সংযোজ্য তথ্যতাম্।
নীত্বা গীত্বা তদা হিত্বা কুটীকাস্ত প্রবর্ত্যতে॥

অর্থাৎ ষড়ঙ্গ সংযোজনাপূর্বক তিনি একটি কুটিকার প্রবর্তন করেছেন। এই ষড়ঙ্গ সম্বন্ধে পরে বলছি। তার পূর্বে "কুটিকা" শব্দটি সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন। সংগীতশাস্ত্রে "কুট্টিকার" নামক একটি শব্দের ব্যবহার আছে। সঙ্গীতরত্নাকরপ্রণেতা শার্ঙ্গদেব বলছেন—"কুট্টিকারোঽন্যধাতৌ তু মাতুকারঃ প্রকীর্তিতঃ"। অর্থাৎ, যিনি অন্য ধাতুতে মাতু রচনা করেন, তিনিই কুট্টিকার। ধাতু[১] শব্দের অর্থ গেয় বস্তু এবং মাতু শব্দের অর্থ বাক্য। এর তাৎপয হচ্ছে এই যে, প্রচলিত কলিনিবদ্ধ একটি গীতরূপকে যিনি পরিবর্তিত করে প্রকাশ করেন, তিনিই "কুট্টিকার"। কুট্টন শব্দের অর্থ ছেদন—এই থেকেই কুট্টিকার শব্দটি এসেছে। এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, জয়দেবরচিত গীতগোবিন্দ প্রবন্ধেব একটি বিশিষ্ট গীতরূপ ছিল; কুম্ভকর্ণ সেই রূপটির বদলে নিজস্ব রীতিতে উক্ত প্রবন্ধের পদগুলিকে অন্য ভাবে রূপায়িত করে প্রকাশ করলেন। এই ভাবে তিনি জয়দেবের রচিত পদকে ভিন্নরূপে প্রকাশ করায় এটি "কুট্টি" বা "কুটিকা" হিসাবে পরিগণিত হল। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেও বলেছেন, "গীতৌ জয়দেবকৃতে ধাতুঃ কুম্ভো নৃপস্তনুতে।" এই শব্দটি উক্ত শ্লোকে "কুটীকা" না হয়ে "কুটিকা" হওয়া উচিত ছিল। সংস্কৃত গ্রন্থে সংগীতের ক্ষেত্রে এই রকম বানানের ব্যতিক্রম প্রায়ই দৃষ্ট হয়ে থাকে।

কুম্ভকর্ণ রসিকপ্রিয়া টীকায় সংগীতাংশ বোঝাবার জন্য তাঁর অপর বিরাট্ সংগীতগ্রন্থ "সঙ্গীতরাজ" থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। এই গ্রন্থটিতেও তাঁর স্বপরিকল্পিত গীতগোবিন্দের অষ্টবিংশ প্রবন্ধের উল্লেখ আছে। উক্ত শাস্ত্রগ্রন্থ অনুমানিক ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়।[২] এই গ্রন্থের প্রবন্ধ অধ্যায়েও তিনি গীতগোবিন্দের যে প্রবন্ধভাগ প্রস্তুত করেন, তার আলোচনা আছে।

জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দ কোন্ পর্যায়ের গীত, সে সম্বন্ধে কোন নির্দেশ দেন নি। তবে গীতগোবিন্দ যে প্রবন্ধ-পর্যায়ের গীত, সেটি প্রমাণিত হয় এই শ্লোকে—

বাগ্দেবতাচরিতচিত্রিতচিত্তসদ্মা
পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্তী।
শ্রীবাসুদেবরতিকেলিকথাসমেত-
মেতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধম্॥

---

১. বাঙ্মাতুরুচ্যতে গেয়ং ধাতুরিত্যভিধীয়তে—সঙ্গীতরত্নাকর, প্রকীর্ণাধ্যায় (অ্যাডায়ার সংস্করণ)

২. Sangitaraja Vol. I ed. Dr. C. R. Kunhan Raja—The Ganga Oriental Series No. 4.

এই "প্রবন্ধ" শব্দের ব্যাখ্যা—"প্রবন্ধং প্রকর্ষেণ বধ্যতে শ্রোতৃণাং হৃদয়স্মিন্নিতি"১—এই ভাবে করলে এর সম্যক্ অর্থ প্রকাশ পায় না। আসলে প্রবন্ধ শব্দের অর্থ কলি বা ধাতুদ্বারা নিবদ্ধ কাব্যসংগীত এবং জয়দেব এই অর্থেও প্রবন্ধ শব্দটির প্রয়োগ করেছেন; কেন না, গীতগোবিন্দ মূলতঃ সংগীতের অন্তর্ভুক্ত।

প্রবন্ধসংগীতের প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীভেদ ছিল—সূড়, আলিক্রম এবং বিপ্রকীর্ণ। জয়দেব এই তিনটির কোন্ শ্রেণী অবলম্বনে গীতগোবিন্দ রচনা করেছিলেন, তারও কোন উল্লেখ উক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তবে সে কালের গীতরীতি এবং মহারাণা কুম্ভের পরিকল্পনা বিচার করে দেখলে অনুমান হয়, গীতগোবিন্দ ছিল প্রধানত সালগ বা ছায়ালগ সূড়শ্রেণীর প্রবন্ধ। গীতগোবিন্দ তৎকালীন রাগসংগীতের পর্যায়ে পড়ে না; কেন না, রাগসংগীতের লক্ষণ এবং আচরণ দেশী প্রবন্ধসংগীতের মত নয়। শার্ঙ্গদেব সংগীতরত্নাকরে স্পষ্টই বলেছেন যে, যদিচ কোন কোন দেশী প্রবন্ধ রাগ অবলম্বনে গীত হয়ে থাকে, তথাপি তাদের রাগগীতির অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয় এবং সেগুলিকে প্রবন্ধসংগীত হিসাবে বিচার করাই সংগত। গীতগোবিন্দের প্রবন্ধগুলিতে যে সব তালের উল্লেখ আছে, সেগুলি দেশী তাল এবং সালগ-সূড় প্রবন্ধেই সেগুলির ব্যবহার হত। অতএব গীতগোবিন্দ যে মূলতঃ সালগ-সূড় শ্রেণীর প্রবন্ধ, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

কুম্ভের পরিকল্পিত সংগীত সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে প্রবন্ধসংগীতের স্বরূপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন, নতুবা বিষয়টি স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে না। গায়কগণ দেশী রাগাদির প্রয়োগে যে 'জনমনোরঞ্জনকারী গীত রচনা করেন, গান বলতে সেই বস্তুই বোঝায়। এই গান এবং প্রবন্ধ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। গান দুই প্রকার—নিবদ্ধ এবং অনিবদ্ধ। নিবদ্ধ গান ধাতু এবং অঙ্গদ্বারা আবদ্ধ। অনিবদ্ধ গান আলাপের মত বন্ধহীন। প্রবন্ধের অবয়বগুলিকে ধাতু বলা হয়। এই রকম চারটি ধাতু আছে—উদ্গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব এবং আভোগ। প্রবন্ধের প্রথম ভাগ হচ্ছে উদ্গ্রাহ। এর পরের অংশটি মেলাপক। প্রবন্ধের তৃতীয় অবয়বের নাম ধ্রুব। এইটি গানের নিত্য অংশ এবং এটি কখনই পরিত্যক্ত হবে না। আভোগ হচ্ছে অন্তিম অবয়ব। ধ্রুব এবং আভোগের মধ্যভাগে অপর একটি ধাতুরও অস্তিত্ব আছে, সেটি হচ্ছে অন্তরা।

প্রবন্ধের অঙ্গ ছয়টি—স্বর, বিরুদ, পদ, তেনক, পাট এবং তাল। এই সবগুলি প্রযুক্ত হলে তাকে ষড়ঙ্গ প্রবন্ধ বলা হয়। সা, রে, গা, মা প্রভৃতিকে স্বর বলা হয়। বিরুদ হচ্ছে গুণবাচক অংশ। পদ বলতে বিশেষ ভাবে গানের বাক্যাংশকে বোঝায়। তেনক শব্দটি মঙ্গলার্থবাচক। মহাবাক্যের আদিতে যেমন "ওঁ তৎসৎ" এইরূপ তত্ত্বনির্দেশে ব্রহ্মকে প্রকাশ করা হয়, সেই রকম তেনক অঙ্গে এইরূপ বাক্য প্রয়োগ দ্বারা মঙ্গল নির্দেশ করা হয়ে থাকে। পাট হচ্ছে বাদ্যাক্ষর বা মৃদঙ্গাদি বাদ্যে প্রযুক্ত বোল। ধা, ধিগ ধিগ, প্রভৃতি বাদ্যের বোল মুখেও উচ্চারিত হত এবং সেটিও পাট অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত।

---

১. টীকা, পূজারী গোস্বামী, কবি জয়দেব ও শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

প্রবন্ধের তিনটি বিভাগের মধ্যে শুদ্ধসূড়ের কৌলীন্য সর্বাপেক্ষা অধিক। সূড় প্রবন্ধ দ্বিবিধ—শুদ্ধ এবং ছায়ালগ বা সালগ। শুদ্ধসূড়ের সঙ্গে প্রাচীন শুদ্ধসংগীতের কতকটা মিল ছিল, কিন্তু সালগসূড়ে নিয়মের অতিলঙ্ঘন ঘটেছে। এই কারণেই এই জাতীয় গানের নাম দেওয়া হয়েছে—ছায়ালগ সূড়। উক্ত সূড় সাত প্রকার—ধ্রুব, মণ্ঠ, প্রতিমণ্ঠ, নিঃসারুক, অড্ড, রাস এবং একতালী। জয়দেব এবং কুম্ভকর্ণ দুজনেই এই সব গীতরীতি অবলম্বন করে সংগীতভাগ রচনা করেন।

## প্রথম শ্লোক

"মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্···"—এইটি গীতগোবিন্দ গ্রন্থের প্রথম শ্লোক। কুম্ভকর্ণ এই প্রথম শ্লোক থেকেই গীত আরম্ভ করেছেন। জয়দেব "প্রলয়পয়োধিজলে"—এই গীতের পূর্বে অপর কোন শ্লোকে রাগ নির্দেশ করেন নি। কুম্ভকর্ণ বলছেন—"গমকালাপপেশলতয়া মধ্যমগ্রামে ষাড়বেন মধ্যমগ্রহেণ মধ্যমাদিরাগেণ গীয়তে"। এই গীতে গমক এবং আলাপ যোজিত হয়েছে। এতে মধ্যমাদি রাগ প্রদত্ত হয়েছে। মধ্যমাদি রাগের একটি বৈশিষ্ট্যও কুম্ভকর্ণ উল্লেখ করেছেন। এই রাগটি গ্রামরাগ মধ্যমগ্রাম থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এর প্রথম (গ্রহ) এবং প্রধান (অংশ) স্বর ছিল মধ্যম এবং অপরাপর লক্ষণ গ্রামরাগ মধ্যমগ্রামের মত। শাস্ত্রানুযায়ী গ্রামরাগ মধ্যমগ্রামের আরোহণে ষড়্জমুখ্য প্রসন্নাদি অলঙ্কারের প্রয়োগ বিধেয়, কিন্তু মধ্যমাদি রাগে গ্রহ এবং অংশস্বর মধ্যম নির্ধারিত হওয়ায় ষড়্জের বদলে এই অলঙ্কারটিতে মন্দ্র মধ্যমের ব্যবহার নির্দিষ্ট হয়েছে। সাধারণত সা সা সা—এইটিই হচ্ছে প্রসন্নাদি অলংকার, কিন্তু মধ্যমের প্রাধান্য থাকাতে এখানে মা মা মা এই অলংকারটিকেই প্রসন্নাদি বলে ধরতে হবে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে মধ্যমকেই ষড়্জ হিসাবে ধরা হচ্ছে। এই কারণেই কুম্ভকর্ণ বলছেন—ষাড়বেন মধ্যমগ্রহেণ মধ্যমাদিরাগেণ গীয়তে।

"প্রলয়পয়োধিজলে···" প্রবন্ধের পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিকে কুম্ভকর্ণ সম্ভাবিতা[১] গীতির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই গীতির একটি প্রধান লক্ষণ গুরুবর্ণের আধিক্য।

## প্রথম প্রবন্ধ—দশাবতার কীর্তিধবল

গীতগোবিন্দের প্রথম গীত "প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং" কুম্ভকর্ণের "দশাবতার-কীর্তিধবল" নামক প্রথম প্রবন্ধ। জয়দেব এই সব গীতে কোন প্রকার বিশেষ প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করেন নি। কুম্ভকর্ণ বলছেন—

অত্র প্রলয়পয়োধীত্যাদি একাদশেম্বপি পদেষু কীর্তিধবলং নাম ছন্দঃ। তল্লক্ষণং যথা—অযুজি পদে দ্বাদশৈব যুজি তু যস্তু হি দশ বাষ্টমাত্রাশ্চেৎ। পরমপি পদযুগমেব তং কীর্তি-ধবলমিহ ধীরাঃ প্রাহুঃ।

---

১. সংক্ষেপিতপদা ভূরিগুরুঃ সম্ভাবিতা মতা। সঙ্গীতরত্নাকর।

কুম্ভকর্ণ কীর্তিধবল নামক ছন্দের উল্লেখ করলেও আসলে এটি একটি প্রবন্ধরূপ। এই নামের কোন ছন্দের অস্তিত্ব নেই। সংগীতরত্নাকর অনুসারে ধবল নামক প্রবন্ধ তিন প্রকার—কীর্তি, বিজয় এবং বিক্রম। ধবলপ্রবন্ধ আশীর্বাদসূচক। সাধারণত এই প্রবন্ধের চরণাদিতে "ধবল" বা বিমলত্ব বোঝায়, এইরকম বাক্য বা শব্দ থাকত।

নিয়মানুসারে কীর্তিধবল চারটি চরণে উপনিবদ্ধ। এর বিষমচরণদ্বয়ে অর্থাৎ প্রথম এবং তৃতীয় চরণে দুটি করে ছ-গণ ( সংগীতশাস্ত্রানুসারে তিনটি গুরুমাত্রায় একটি ছ-গণ হয় ) থাকে এবং সমচরণে অর্থাৎ দ্বিতীয় এবং চতুর্থ চরণে এর উপর একটি ত-গণ ( একটি গুরু এবং একটি লঘু ) বা দ-গণ ( একটি গুরু ) যুক্ত হয়। বিষমচরণে দুটি ছ-গণ থাকলে মোট বারটি মাত্রা হয় এবং সমচরণে এর সঙ্গে ত-গণ অর্থাৎ আরও তিনটি মাত্রা যোগ করলে পোনেরো মাত্রা হয়; দ-গণ যোগ করলে মাত্রাসংখ্যা হয় চোদ্দ, এটি সাধারণ নিয়ম। কিন্তু শার্ঙ্গদেব বলছেন, সাধারণ নিয়ম ছাড়াও এই প্রবন্ধ লোকপ্রসিদ্ধি অনুসারে বা শিল্পীর ইচ্ছানুসারে গাওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে; কেন না, কুম্ভকর্ণের মতানুসারে দ্বিতীয় এবং চতুর্থ পদে দশ বা অষ্ট মাত্রার সমাবেশ হচ্ছে।

"জয় জগদীশ হরে"—এই ধ্রুব অংশটিতে কুম্ভ ভ্রমর নামক একটি ছন্দ যোজিত করেছেন। কাশী সংস্কৃত সিরিজের "বৃত্তরত্নাকর" গ্রন্থের ১৩০ পৃষ্ঠায় এই ছন্দের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া আছে।

এই কীর্তিধবল প্রবন্ধ সম্বন্ধে কুম্ভকর্ণ আরো বলছেন—

ছন্দসা কীর্তিপূর্বেণ ধবলেন বিনির্মিতৈঃ।<br>
পাদান্তাভোগরুচিরস্ততঃ পাটস্বরাঙ্কিতঃ ॥

সাধারণ নিয়মানুসারে ধবলপ্রবন্ধ উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুব—এই দুই ধাতুদ্বারা নিবদ্ধ। গীতের পূর্বার্ধ উদ্‌গ্রাহ এবং উত্তরার্ধ ধ্রুব। আভোগ অংশটি পৃথক্‌ভাবে কর্তব্য।[১] কুম্ভকর্ণের উদ্ধৃত শ্লোক অনুসারে বোঝা যায়, তিনি পৃথক্‌ভাবে আভোগের অনুষ্ঠান করেছিলেন। তদীয় প্রবন্ধের শেষে পাট বা মৃদঙ্গের বোল উচ্চারিত হত এবং স্বরানুষ্ঠান বা সর্গমেরও অনুষ্ঠান করা হত।

কুম্ভকর্ণ এই প্রবন্ধটিতে মধ্যমাদি রাগ এবং আদিতালের প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু জয়দেব এই গীতে মালব রাগ এবং রূপক তাল নির্দিষ্ট করেছিলেন। কুম্ভকর্ণ "কেশব ধৃতমীনশরীর" এই অংশটিতে অর্ধমাগধী রীতির প্রয়োগ করেছিলেন। প্রাচীন সংগীতে একটি শব্দের পর পর তিন বার উচ্চারণ হলে তাকে বলা হত মাগধী পদ্ধতি এবং একটি শব্দের দ্বিরুক্তি ঘটলে তাকে বলা হত অর্ধমাগধী রীতি। যেমন—"দেবং রুদ্রং বন্দে"—এই কথাটি যদি "দেবং দেবং রুদ্রং রুদ্রং বন্দে" এই ভাবে গাওয়া হয়, তবে সেটি হল অর্ধমাগধী রীতি। কুম্ভকর্ণ

---

১. ত্রিষপি ধবলভেদেষু পূর্বার্ধমুদ্‌গ্রাহঃ উত্তরার্ধং ধ্রুবঃ আভোগঃ পৃথক্‌কর্তব্যঃ—
কল্লিনাথ। টীকা, সঙ্গীতরত্নাকর

"কেশব" শব্দটি দুবার উচ্চারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন—"গানবেলায়াং কেশব কেশব ইতি কীর্তনং দ্বিরুক্তিঃ ॥ অর্ধমাগধী রীতিঃ ॥"

## দ্বিতীয় প্রবন্ধ—হরিবিজয়মঙ্গলাচার

গীতগোবিন্দের দ্বিতীয় গীত "শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল···" প্রবন্ধটির নাম কুম্ভকর্ণ দিয়েছেন—হরিবিজয়মঙ্গলাচার। এটিতে জয়দেব গুর্জরীরাগ এবং নিঃসার তাল প্রয়োগ করেছিলেন ; কুম্ভকর্ণ ললিত রাগ এবং লঘু আদিতাল যোজনা করেছেন। এই গানটিকে মঙ্গলনামক প্রবন্ধপর্যায়ের অন্তর্গত করা হয়েছে। এই প্রবন্ধের শেষ পদ— "শ্রীজয়দেব-কবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি।" কুম্ভকর্ণ "মঙ্গল" নামক শব্দের উল্লেখে এটি যে "মঙ্গল" প্রবন্ধের অন্তর্গত ছিল, সেটিই বোঝাতে চেয়েছেন। শার্ঙ্গদেব সংগীতরত্নাকরে মঙ্গল প্রবন্ধের বর্ণনা দিয়েছেন—

কৈশিক্যাং বোট্টরাগে বা মঙ্গলং মঙ্গলৈঃ পদৈঃ।
বিলম্বিতলয়ে গেয়ং মঙ্গলচ্ছন্দসাথ বা ॥

মঙ্গলপদযুক্ত মঙ্গলপ্রবন্ধ কৈশিকী বা বোট্টরাগ অবলম্বনে বিলম্বিত লয়ে অথবা মঙ্গলছন্দ অবলম্বনে গীত হয়। মঙ্গলপদ কি রকম হওয়া উচিত, সেটি বোঝাবার জন্য সঙ্গীতরত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথ বলছেন—"শঙ্খচক্রাব্জকোককৈরবাদিশংসিভিরিত্যর্থঃ"। মঙ্গলছন্দের লক্ষণ এবং উদাহরণ সঙ্গীতরত্নাকরে প্রদত্ত হয়েছে—

পঞ্চ চকারগণাঃ প্রতিপাদগতাশ্চে-
ন্মঙ্গলমাহুরিদং সুধিয়ঃ খলু বৃত্তম্ ॥

মঙ্গলনামক ছন্দ অনুসারে প্রতি পাদে পাঁচটি করে চ-গণের অস্তিত্ব থাকবে। সঙ্গীত-শাস্ত্রানুযায়ী দুটি গুরুমাত্রার সন্নিবেশে একটি চ-গণ হয়। এই দুটি গুরুমাত্রাকে চারটি লঘুমাত্রায় ভেঙে নিলেও কোন দোষ হয় না। তা হলে এটি দাঁড়ায় এই রকম—

পঞ্চচ। কারগ। ণাঃ প্রতি। পাদগ। তাশ্চে।
ন্মঙ্গল। মাহুরি। দং সুধি। য়ঃ খলু। বৃত্তম্।

এই ভাবে প্রতি পাদে পাঁচটি চতুর্মাত্রিক গণ সম্পাদিত করে মঙ্গলছন্দের পরিকল্পনা করা হয়েছে। কুম্ভকর্ণও এই সূত্রটিই উদ্ধৃত করেছেন।

মঙ্গলপ্রবন্ধ ছাড়া আরও একটি প্রবন্ধ ছিল, তার নাম "মঙ্গলাচার" প্রবন্ধ। কুম্ভকর্ণ মঙ্গলাচার প্রবন্ধে এই গীতের অনুষ্ঠান করেছিলেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি তাঁর সংগীতরাজ নামক গ্রন্থ থেকে মঙ্গলাচার প্রবন্ধের পরিচয় উদ্ধৃত করেছেন—

ছন্দসা মঙ্গলাখ্যেন খননং ( ? ) গদ্যপদ্যয়োঃ।
আলাপশ্চ প্রতিপদং নানাগমকপেশলঃ ॥
ধ্রুবং প্রতিপদং রাগো ললিতস্তাল উচ্যতে।
আদিতালঃ স্বরাস্তেতাঃ প্রবন্ধে তে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥
স হরিবিজয়াখ্যশ্চ মঙ্গলাচার উচ্যতে।

হরিবিজয়মঙ্গলাচার নামক প্রবন্ধ মঙ্গলছন্দে গদ্য এবং পদ্যের সংমিশ্রণে বিরচিত। এর প্রতি পদে আলাপের অনুষ্ঠান এবং নানাপ্রকার গমকের প্রয়োগ হয়। প্রতি পদে ধ্রুবের আবৃত্তি হয়ে থাকে। গীতটি ললিত রাগে আদিতালে গাওয়া হয়। এতে স্বরানুষ্ঠানও কর্তব্য।

আলাপের অনুষ্ঠানের নিমিত্তই কুম্ভকর্ণ প্রতি পদের শেষে একটি "এ"-কার যোগ করেছেন এবং এই "এ"কারটিকে নির্দেশ করে বলেছেন—"এ"-কারাদ্যালাপো জ্ঞেয়ঃ॥ প্রতি পদেই "জয় জয় দেব হরে"—এই ধ্রুবটি যোজিত হয়েছে।

এই প্রবন্ধের শেষ পদ—"মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি জয় জয় দেব হরে।" মঙ্গল শব্দের তাৎপর্য পূর্বেই বলা হয়েছে। "উজ্জ্বল" শব্দ সম্বন্ধে কুম্ভকর্ণ বলছেন—"রম্যগানাদ্যখিলৈর্গীতগুণৈর্যুক্তং ভীতশঙ্কিতাদিদোষরহিতম্।" সংগীতরত্নাকরে এই গুণটিকে বলা হয়েছে "ছবিমান" বা দীপ্তিসম্পন্ন গীতক্রিয়া। কণ্ঠের গুণে অনেক সময় সংগীত উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়। টীকাকার সিংহভূপাল এই শব্দের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলছেন—যতশ্চ শব্দে জ্যোতিঃ প্রতীয়তে।

কুম্ভকর্ণ বলছেন—শ্রিতকমলাকুচেত্যাদি মঙ্গলং নাম ছন্দঃ। পূর্বে মঙ্গল ছন্দের বিষয় বলা হয়েছে। এই গানটি উক্ত ছন্দে এই ভাবে বিন্যস্ত হবে—

শ্রিত কম। লা—কু চ। ম ন্ ড ল। ধৃ ত কু ন্। ড ল এ —। এই ভাবে এতে পাঁচটি চগণের প্রয়োগ হয়। ছন্দপূর্তির পরে শেষের এ-কারটি আরও দীর্ঘায়িত করে আলাপের নিয়মে গাওয়া হত।

পরবর্তী "পদ্মাপয়োধরতটীপরিরম্ভ……" এবং "বসন্তে বাসন্তী…" এই দুটি শ্লোকে জয়দেব কোন বিশেষ সুর সংযোগ করেন নি। কুম্ভকর্ণ এই দুটিতে বসন্ত রাগ প্রয়োগ করেছেন।

## তৃতীয় প্রবন্ধ—মাধবোৎসবকমলাকর

গীতগোবিন্দের "ললিতলবঙ্গলতা…" এই তৃতীয় প্রবন্ধটিতে জয়দেব বসন্তরাগ এবং যতিতাল যোজিত করেছিলেন। কুম্ভ যতিতালের বদলে ঝম্পাতালের প্রয়োগ করেছেন। এই প্রবন্ধের তিনি নাম দিয়েছেন—মাধবোৎসবকমলাকর। এই গীতের বর্ণনা উদ্ধৃত করছি—

রচিতং গদ্যপদ্যাদ্যৈর্বসন্তে পার্থিবোৎসবে।
বসন্তরাগে ঝম্পাখ্যতালে মধ্যলয়াঞ্চিতে॥
গলমালপ্তিভূয়িষ্ঠঃ পূর্ণকল্পঃ প্রকীর্তিতঃ।
পূর্তৌ পুনস্তেন পাটস্বরাঞ্চিতবিরাজিতঃ॥
মাধবোৎসবকমলাকরনামা প্রবন্ধরাট্॥
ইতি মাধবোৎসবকমলাকরনামা তৃতীয়ঃ প্রবন্ধঃ॥

কুম্ভকর্ণের টীকা অনুসারে জানা যাচ্ছে, প্রত্যেক প্রবন্ধের প্রথমেই ধ্রুব অংশটি এক বার গাওয়া হত। এ ক্ষেত্রেও "বিহরতি হরিরিহ…" এই পদটি প্রথমে আচরণ করবার নির্দেশ দেওয়া

হয়েছে। প্রথমে ধ্রুব এবং তার পর তিনটি পদ অনুষ্ঠিত হবার পর—"মদনমহীপতিকনক-দণ্ডরুচি…" এই পদের পূর্বে কিঞ্চিৎ আলাপ যোজনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি শেষ হচ্ছে "শ্রীজয়দেবভণিতম্…" এই পদে। এইখানে তেনকের অনুষ্ঠান নির্ধারিত হয়েছে। তার পরে পাট অর্থাৎ মৃদঙ্গবাদ্যের বোল উচ্চারণ এবং অতঃপর স্বরাচরণ নির্দিষ্ট হয়েছে।

শেষ পদের টীকায় কুম্ভকর্ণ একবার গুর্জরীরাগের উল্লেখ করেছেন। এই অংশে তিনি গুর্জরীরাগ প্রয়োগ করেছেন কি না বোঝা যাচ্ছে না। ঝম্পাতাল ছাড়া লয় নামক একটি ছন্দের উল্লেখও তিনি করেছেন। গুর্জরীরাগ এবং লয়তাল আংশিকভাবে প্রযুক্ত হলেও গানটি প্রধানতঃ বসন্তরাগে ঝম্পাতালে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

## চতুর্থ প্রবন্ধ—সামোদদামোদর ভ্রমরপদ

"চন্দনচর্চিতনীলকলেবর পীতবসনবনমালী…"—এইটি চতুর্থ প্রবন্ধ। গীতগোবিন্দের প্রথম সর্গের নাম "সামোদদামোদর," এর সঙ্গে মিলিয়ে কুম্ভকর্ণ এই প্রবন্ধের নাম দিয়েছেন—সামোদদামোদর ভ্রমরপদ। এই প্রবন্ধের যে লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে, সেটি উদ্ধৃত হল :—

যত্র স্যাৎগুর্জরীরাগস্তালো ঝম্পেতি ভাগশঃ।
যথাশোভং প্রয়োগোঽপি গদ্যপদ্যাঙ্কিতান্তরঃ॥
আভোগান্তে স্বরাঃ পাটাঃ পুনঃ পদ্যানি কানিচিৎ।
সামোদদামোদরাখ্যঃ প্রবন্ধো ভ্রমরঃ পদম্॥
ইতি সামোদদামোদরভ্রমরপদনামা চতুর্থঃ প্রবন্ধঃ॥

এই গীতটিতে জয়দেব কর্তৃক নির্দিষ্ট রামকিরী রাগ এবং যতি তালের পরিবর্তে কুম্ভকর্ণ গুর্জরীরাগ এবং ঝম্পা তাল প্রয়োগ করেছেন। প্রবন্ধের অন্তরভাগে গদ্য এবং পদ্যের যোজনা করে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। কুম্ভকর্ণের বর্ণনা অনুসারে অনুমান হয়, স্থানে স্থানে "প্রয়োগ" নামক গীতক্রিয়ার অনুষ্ঠান হত। "যথাশোভং প্রয়োগোঽপি গদ্য-পদ্যাঙ্কিতান্তরঃ"—এই বাক্যের অর্থ এই হতে পারে যে, গীতের অন্তরভাগে শোভনভাবে গদ্য এবং পদ্যের সন্নিবেশ করা হত। অথবা "প্রয়োগোঽপি"—এই শব্দে "প্রয়োগ" নামক একটি রূপবন্ধের সন্নিবেশ করা হয়েছে, এই অনুমানও অসংগত নয়। "প্রয়োগ" শব্দের অর্থ আলাপের মত সংগীতাচরণ। শার্ঙ্গদেব সঙ্গীতরত্নাকরে বলছেন—আলাপোগমকালাপ্তির-ক্ষরৈর্বর্জিতা মতা। সৈব প্রয়োগশব্দেন শার্ঙ্গদেবেন কীর্তিতা॥ অক্ষরবর্জিত গমকবিশিষ্ট সুরের আলাপকে বলে "প্রয়োগ"। ইতিপূর্বে আলোচনায় দেখা গেছে যে, কুম্ভকর্ণ গীতের স্থানে স্থানে এই প্রকার আলাপের অবকাশ রেখেছেন। অতএব এ ক্ষেত্রেও "প্রয়োগ" শব্দ আলাপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে—এ অনুমান অসংগত নয়।

কুম্ভকর্ণ এই প্রবন্ধে আভোগের পরে স্বর এবং পাটানুষ্ঠানের নির্দেশ দিয়েছেন। "শ্রীজয়দেবভণিতমিদমদ্ভুতকেশবকেলিরহস্যম্"—এই শেষ পদটির পরে তিনি টীকায় বলছেন—"অত্র স্বরা ঋষভাদ্যা পাটাঃ," অর্থাৎ এই স্থানে যে স্বরানুষ্ঠান বা সর্গম বিধেয়, সেটি

ঋষভ দিয়ে আরম্ভ করতে হবে। গুর্জরী রাগের গ্রহ ( যে স্বর প্রারম্ভে উচ্চারিত হয় ) এবং অংশ ( প্রধান ) স্বর হচ্ছে ঋষভ—এই কারণেই কুম্ভ এই স্বরটির বিশেষ উল্লেখ করেছেন।[১] স্বরানুষ্ঠানের পর পাটানুষ্ঠান এবং তৎপরে গীতশেষে পদ্যাংশের আবৃত্তি বিধেয়।

কুম্ভকর্ণ আভোগাংশের টীকায় "লয়" নামক একটি ছন্দের উল্লেখ করেছেন। এর লক্ষণ দিয়েছেন—মুনিষগণৈর্লয়মামনন্তি তজ্জ্ঞাঃ। তদুক্তং ছন্দশ্চূড়ামণৌ চিলয় ইতি॥ সঙ্গীত-রত্নাকর অনুযায়ী এই তালে পর পর একটি গুরু, একটি লঘু, তিনটি প্লুত, একটি গুরু এবং তিনটি দ্রুত মাত্রার সমাবেশ নির্ধারিত হয়েছে।[২]

"ভ্রমরপদ" শব্দটির তাৎপর্য বোঝা দুঃসাধ্য। তবে সঙ্গীতরত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথের[৩] বিবৃতি অনুসারে জানা যায় যে, প্রসিদ্ধ গায়ক গোপালনায়ক "রাগকদম্বক" শ্রেণীর অন্তর্গত ভ্রমর নামক এক প্রকার গীতানুষ্ঠানে পারদর্শী ছিলেন। এই প্রবন্ধে বিবিধ রাগ এবং তালের প্রয়োগ হত।

অক্লেশকেশব নামক দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে যে শ্লোকটি আছে, জয়দেব তাতে কোন স্বর নির্দেশ করেন নি। কুম্ভকর্ণ এই শ্লোকটিতে ধন্নাসী রাগ এবং বর্ণযতি তাল প্রয়োগ করেছেন। টীকার প্রারম্ভে তিনি বলছেন—

ধন্নাসীরাগেণ গীয়তে॥
ভুবনেশপাদকমলং প্রণম্য কুম্ভো নৃপতিরতিবিমলম্।
জয়দেবরচিতমাতুং যুনক্তি যুক্তেন ধাতুনা গাতুম্॥

জয়দেবরচিত "মাতু" অর্থে জয়দেবরচিত পদ। সংগীতশাস্ত্রানুসারে গীতের বাক্যাংশকে মাতু বলে এবং উদ্গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব, আভোগ—এই কলিগুলিকে বলে "ধাতু"।

এই গীতটিতে কুম্ভকর্ণ বর্ণযতি তাল প্রয়োগ করেছেন। বর্ণযতি তালের বর্ণনা তিনি দিয়েছেন—"লঘুশ্চৈকো দ্রুতদ্বয়ম্" অর্থাৎ একটি লঘু এবং দুটি দ্রুতমাত্রার সংযোগে বর্ণযতি তাল সম্পূর্ণ হচ্ছে। রত্নাকরের মতে বর্ণযতি তাল—"লৌ দৌ বর্ণযতির্ভবেৎ"। অর্থাৎ, দুটি লঘু এবং দুটি দ্রুতের সহযোগে বর্ণযতি তাল রচিত হয়। কুম্ভ রত্নাকরনির্দিষ্ট বর্ণযতি তাল অনুসরণ করেন নি।

## পঞ্চম প্রবন্ধ—মধুরিপুরত্নকণ্ঠিকা

"সঞ্চরদধরসুধামধুরধ্বনি…" কুম্ভকর্ণের "মধুরিপুরত্নকণ্ঠিকা" নামক পঞ্চম প্রবন্ধ। এই গীতটিতে জয়দেব-প্রযুক্ত গুর্জরীরাগ এবং যতিতালের পরিবর্তে কুম্ভকর্ণ ধন্নাসিকা রাগ এবং বর্ণযতিতাল প্রয়োগ করেছেন। এই প্রবন্ধের বর্ণনায় তিনি বলেছেন :—

---

১. গুর্জরিকামান্তা রিগ্রহাংশা মধ্যমভাক্।
রিতারা রিধভূয়িষ্ঠা শৃঙ্গারে তাড়িকা মতা॥ সঙ্গীতরত্নাকর

২. গলৌ প্লুতত্রয়ং বক্রঃ প্লুতোবিন্দুত্রয়ং লয়েঃ, সঙ্গীতরত্নাকর, পঞ্চমতালাধ্যায়ঃ

৩. সঙ্গীতরত্নাকর, প্রবন্ধাধ্যায়—কল্লিনাথের টীকা পৃ. ২৮৩ আড়ায়ার সংস্করণ

রাগো ধন্নাসিকা যত্র তালো বর্ণযতিঃ স্মৃতঃ।
চম্পূবন্ধপ্রয়োগান্তে গমকানেকবিস্তরঃ॥
তদন্তে স্যুঃ স্বরাস্তেনাঃ পাটাঃ শুচিরসাঞ্চিতাঃ।
প্রবন্ধোঽয়ং মুররিপোঃ পুরস্তাদ্রত্নকণ্ঠিকা॥

এই লক্ষণ থেকে মনে হয়, এই সব গীতে বিস্তারেরও বেশ সুযোগ ছিল। চম্পূর উল্লেখে এই সকল গীতে কিছু গদ্যাংশ যোজিত হত বলে মনে হয়; কেন না, গদ্যাংশ এবং পদ্যাংশ মিলিয়েই চম্পূ প্রবন্ধ প্রস্তুত হত। এই গীতের ভণিতা-অংশে প্রয়োগ বা আলাপ এবং তেনক (মঙ্গলোচ্চারণ), তালের বোল প্রভৃতি যোজনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রতিটি গানের শেষে সুর-তাল প্রভৃতির সহযোগে তাকে উজ্জ্বল করে গানটি জমিয়ে তোলা হত। ভণিতা-অংশটি লয় নামক ছন্দে গান করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আরও অনেক ক্ষেত্রে ভণিতাটি উক্ত ছন্দেই গীত হয়েছে। এর পরের শ্লোকটিতে ভৈরব রাগ প্রযুক্ত হয়েছে। জয়দেব এই শ্লোকটির জন্য কোনও রাগ নির্দেশ করেন নি।

## ষষ্ঠ প্রবন্ধ—অক্লেশকেশবকুঞ্জরতিলক

পরবর্তী গীত "নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তম্..." কুম্ভকর্ণের "অক্লেশ-কেশবকুঞ্জরতিলক" নামক ষষ্ঠ প্রবন্ধ। জয়দেবপ্রদত্ত সুর ছিল মালব রাগ (কুম্ভ এটিকে "মালব-গৌড়" উদ্ধৃত করেছেন), এবং তাল একতালী। কুম্ভকর্ণ এই প্রবন্ধে ভৈরবরাগ এবং বর্ণযতিতাল প্রয়োগ করেছেন। তাঁর সঙ্গীতরাজ নামক গ্রন্থ থেকে এই প্রবন্ধের লক্ষণ উদ্ধৃত হয়েছে :—

গীতৌ ভৈরবরাগেণ তালে বর্ণযতৌ যথা।
আভোগান্তাস্থিতৈঃ পাটৈঃ স্বরৈঃ পদ্যাঞ্চিতস্তুতঃ॥
অক্লেশকেশবাদিশ্চ কুঞ্জরতিলকাভিধঃ।
ইতি অক্লেশকেশবকুঞ্জরতিলকনামা ষষ্ঠপ্রবন্ধঃ॥

এ ক্ষেত্রেও আভোগ অর্থাৎ "শ্রীজয়দেবভণিতমিদমতিশয়মধুরিপুনিধুবনশীলম্..." এই পদের পরে পাট এবং স্বর উচ্চারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই পদটিতেও লয় নামক ছন্দ প্রযুক্ত হয়েছে। পরবর্তী শ্লোকগুলিতেও সুর যোজনা করা হয়েছে, তবে "সর্বত্র স্থিতলয়া গীতিঃ।"

## সপ্তম প্রবন্ধ—মুগ্ধমধুসূদনহংসক্রীড়

কুম্ভকর্ণ গীতগোবিন্দের তৃতীয় সর্গের প্রথম শ্লোকটি গৌড়কৃতি রাগে গাইবার নির্দেশ দিয়েছেন। জয়দেব এই শ্লোকে কোন সুর অর্পণ করেন নি। প্রথম দুটি শ্লোকের পর সপ্তম প্রবন্ধ "মামিয়ং চলিতা..." এই গীতটিতেও গৌড়কৃতি রাগই যোজনা করা হয়েছে। জয়দেব এই প্রবন্ধে গুর্জরীরাগ প্রদান করেছিলেন। তিনি এর সঙ্গে যতিতাল যুক্ত করে-

ছিলেন, কুম্ভ তার বদলে প্রয়োগ করেছেন প্রতিমঠ তাল। সর্গের নামের সঙ্গে মিলিয়ে এই প্রবন্ধের নামকরণ হয়েছে "মুগ্ধমধুসূদনহংসক্রীড়" প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের আভোগ অংশ হচ্ছে—"বণিতং জয়দেবকেন হরিরিদং প্রবণেন। কেন্দুবিল্বসমুদ্রসম্ভবরোহিণীরমণেন।" এই পদটির পরে পাট ও স্বরানুষ্ঠান নির্দিষ্ট হয়েছে। বাকি পদগুলি পদ্যাংশ হলেও সুরেই আবৃত্তি করা হত বলে মনে হয়।

## অষ্টম প্রবন্ধ—হরিবল্লভ-অশোকপল্লব

চতুর্থ সর্গের প্রথম গান "নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্…" কুম্ভকর্ণের "হরিবল্লভ-অশোকপল্লব" নামক অষ্টম প্রবন্ধ। কুম্ভকর্ণ এই প্রবন্ধের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন—

প্রতিমঠতালেন রাগে দেশাঙ্কসংজ্ঞিতে।
পদাং তুর্যাক্ষরৈর্যুক্তো পদাং সংগমতাস্তথা॥

এই শ্লোকে "পদাং তুর্যাক্ষরৈর্যুক্তো পদাং সংগমতাস্তথা"—এই কথাটির প্রকৃত অর্থ বোঝা কঠিন। তুর্যাক্ষর অর্থে চারটি অক্ষরের সমষ্টিগত তালের একটি খণ্ড বোঝানো হয়েছে বলে মনে হয় এবং উভয় চরণই সমান ভাবে গাওয়া হবে—বোধ করি, এই রকম ইঙ্গিতই করা হয়েছে। প্রতিমঠ তাল ষণ্মাত্রিক। এর বিন্যাস হচ্ছে পর পর দুটি লঘু, দুটি গুরু এবং দুটি লঘু। কিন্তু, এই দুটি গুরুকে ভেঙে চারটি লঘুতে পরিণত করলেই এটি অষ্টমাত্রিকে রূপান্তরিত হয়। তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে কি ভাবে এটিকে দেখান হয়েছে, এ যুগে সেটি লিখে বোঝানো অসম্ভব। এই প্রবন্ধটি অবশ্য চতুর্মাত্রিক ছন্দেই বিন্যস্ত রয়েছে। যথা—

নিন্দতি। চন্দন। মিন্দুকি। রণমনু। বিন্দতি। খেদম। ধীরম্। ০০০০।
ব্যালনি। লয়মিল। নেনগ। রলমিব। কলয়তি। মলয়স। মীরম্। ০০০০।

এর পরে বলা হয়েছে :—

আকারোপচিতালাপগমকাকুলবিগ্রহঃ।
আভোগস্তেনকৈঃ পাটৈঃ প্রচুরৈরতিপেশলঃ॥
হরিবল্লভপূর্বোঽয়মশোকপল্লবঃ স্মৃতঃ॥
ইতি হরিবল্লভ-অশোকপল্লবনামাষ্টমঃ প্রবন্ধঃ॥

"আকারোপচিতালাপ" এই কথাটির অর্থ এই যে, আলাপটি "আ—" এই স্বর ধরে করতে হবে। উপরোক্ত শ্লোকের যে তালাংশ বিন্দুচিহ্নে প্রদর্শিত হয়েছে, সেই সব স্থানেই সম্ভবতঃ এই ভাবে গেয়ে তালপূর্তি করা হত।

এই প্রবন্ধে জয়দেব কর্ণাট রাগ এবং একতালী তাল প্রয়োগ করেছিলেন। কুম্ভকর্ণ তার বদলে দেশাঙ্ক রাগ (দেশাখ্য ?) এবং প্রতিমঠ তাল প্রয়োগ করেছেন। যথানিয়মে "সা বিরহে তব দীনা" এই ধ্রুবপদটি আচরণ করে এই প্রবন্ধটি আরম্ভ করা হয়েছে। এই প্রবন্ধের আভোগ অংশটিতে বৈশিষ্ট্য আছে।

শ্রীজয়দেবভণিতমিদমধিকং যদি মনসা নটনীয়ম্।
হরিবিরহাকুলবল্লবযুবতিসখীবচনং পঠনীয়ম্॥

এই শ্লোকের "নটনীয়ম্" শব্দ সম্পর্কে কুম্ভকর্ণ টীকায় বলেছেন—নটশব্দেন নাট্যস্থাভিনয়-প্রাধান্যাদভিনয়ো বিবক্ষিতঃ। অথবা নটনীয়মিত্যাস্বাদনীয়ম্। রসনীয়মিতি যাবৎ। নাট্যশব্দো রসে মুখ্যঃ ইতি ভারতীয়ে। কিম্ভূতমিদম্। সখীমধিকৃত্য বর্তমানম্। তর্হি হরিবিরহাকুলবল্লবযুবত্যা রাধায়াঃ সখ্যা বচনং পঠনীয়ম্। জয়দেবভণিতেস্বিদমেব সারমিত্যর্থঃ। এ ক্ষেত্রে নটনীয় শব্দটির অর্থ পাঠকালে চিত্তে আস্বাদনীয় বা রসনীয়, এরূপ করাই সমীচীন। কিন্তু গীতগোবিন্দ নাট্যরূপে অভিনীত হওয়ার প্রসিদ্ধি থাকাতে অভিনয় বা সাক্ষাৎ নটনও বিবক্ষিত হতে পারে। তবে কুম্ভকর্ণ পঠনীয় ভাবটিই গ্রহণ করেছেন।

এই আভোগ অংশে যথারীতি তেন এবং পাট প্রচুর পরিমাণে এবং অতি পেশল ভাবে অর্থাৎ অতি কোমল এবং মনোরম ভাবে প্রযুক্ত হয়েছে।

## নবম প্রবন্ধ—স্নিগ্ধমধুসূদনরাসাবলয়

"স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্..." কুম্ভকর্ণের "স্নিগ্ধমধুসূদনরাসাবলয়" নামক নবম প্রবন্ধ। এটি জয়দেবপ্রদত্ত দেশাখ্য রাগ এবং একতালী তালের পরিবর্তে কুম্ভকর্তৃক মালবশ্রী রাগে এবং নিঃসারুকতালে অনুষ্ঠিত হয়েছে। টীকার শেষাংশে বলা হয়েছে—"বাগ্‌গেয়কার-নামাঙ্কিতপদস্তেনসন্ততিঃ। ততঃ পাটাঃ পদানি স্যুঃ পঞ্চষাণি রসোঽত্র ষঃ।" বাগ্‌গেয়কার বলতে গাতার নাম বোঝায়। এ ক্ষেত্রে এটি জয়দেবের ভণিতাযুক্ত পদ বোঝাচ্ছে। এটি আভোগ অংশ এবং যথারীতি এখানে তেন এবং পাট অনুষ্ঠান যোজনা করা হয়েছে। "পঞ্চষ" শব্দের অর্থ হচ্ছে পঞ্চ বা ষষ্ঠ পরিমাণ ভাগ। পাঁচটি-ছটি পদও এতদ্দ্বারা বোঝা যেতে পারে। আভোগের পরে যে পদসংখ্যা গাওয়া হবে, সেটি যেন পাঁচ কিম্বা ছয়টি পদের মধ্যে নির্দিষ্ট থাকে, সেটাই এই পঞ্চষ শব্দে বোঝানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আভোগের পর আরও পাঁচটি শ্লোক বা পদ গেয়ে সর্গটি শেষ হচ্ছে।

কুম্ভকর্ণ তদীয় সঙ্গীতরাজ নামক গ্রন্থ থেকে এই প্রবন্ধের পরিচয় দিয়েছেন :—

মালবশ্রীঃ স্মৃতো রাগস্তালো নিঃসারুসংজ্ঞকঃ।
বাগ্‌গেগয়কারনামাঙ্কিতপদস্তেন সন্ততিঃ॥
ততঃ পাটাঃ পদানি স্যুঃ পঞ্চষাণি রসোঽত্র ষঃ।
শৃঙ্গারো বাসুদেবস্য ক্রীড়নং রাসকাদিভিঃ॥
ছন্দোঽপি রাসকো জ্ঞেয়ং স্বেচ্ছয়া বা কৃতং ভবেৎ।
স্নিগ্ধমধুসূদনোঽয়ং রাসাবলয়নামকঃ॥
প্রবন্ধঃ পৃথিবীভর্ত্রা প্রবন্ধঃ প্রীতয়ে হরেঃ।
ইতি স্নিগ্ধমধুসূদনরাসাবলয়নামক নবমঃ প্রবন্ধঃ॥

এইখানে "রাসাবলয়" শব্দটির একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। রাসাবলয় বা "রাসবলয়" হচ্ছে সূড় নামক প্রবন্ধগোষ্ঠীর একটি রূপ। এ থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, সে কালে গীতগোবিন্দ সূড় শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল। কুম্ভকর্ণ এই নবম প্রবন্ধটি রাসবলয় শ্রেণীর গীতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। রাসবলয় প্রবন্ধ রাসক বা আদি তালে রচিত হত। কুম্ভকর্ণ পূর্বে গানটি নিঃসারু তালে গেয়, এইরকম নির্দেশ দিয়েছেন; কিন্তু গীতটি রাসবলয় প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করায় এটি যে রাসকতালে গাওয়া যেতে পারে, সেটিও স্বীকার করেছেন। শার্ঙ্গদেবের মতানুসারে ছ-গণ বা তিনটি গুরু মাত্রায় নিবদ্ধ রাসকপ্রবন্ধের নাম রাসবলয়।

"প্রবন্ধঃ পৃথিবীভর্ত্রা প্রবন্ধঃ প্রীতয়ে হরেঃ" এই চরণটি কুম্ভকর্ণ নিজের সম্বন্ধে আরোপ করেছেন। অর্থাৎ, পৃথিবীর ভর্তা মহারাজ কুম্ভ হরির প্রীতির নিমিত্ত এইরূপ একটি প্রবন্ধ প্রকৃষ্টরূপে বদ্ধ করেছেন।

## দশম প্রবন্ধ—হরিসমুদয়গরুড়পদ

পঞ্চম সর্গের "বহতি মলয়সমীরে " গীতটি কুম্ভকর্ণের হরিসমুদয়গরুড়পদ নামক দশম প্রবন্ধ। জয়দেব এই গানে দেশবরাড়ী রাগ এবং রূপক তাল প্রয়োগ করেছিলেন। কুম্ভ প্রয়োগ করেছেন কেদাররাগ এবং নিসারু তাল। কবিনামাঙ্কিত পদের পর স্বল্পতর পাট অনুষ্ঠান কর্তব্য। সঙ্গীতরাজ থেকে এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে :—

নিঃসারুতালরচিতা রাগে কেদারসংজ্ঞকে।
কবিনামাঙ্কিতপদাৎ পাটৈঃ স্বল্পতরৈশ্চিতঃ॥
ততঃ পশ্চাৎ বিলাসে সোল্লাসতে জগতীপতেঃ।
ইত্থং হরিসমুদয়াৎ গরুড়িপদ সংজ্ঞকঃ॥
প্রবন্ধঃ পৃথিবীভর্ত্রা হরিভক্তেন বর্ণিতঃ।
ইতি হরিসমুদয়গরুড়পদনামা দশমঃ প্রবন্ধঃ॥

## একাদশ প্রবন্ধ

একাদশ সংখ্যক প্রবন্ধ "রতিসুখসারে গতমভিসারে···" এটিও পূর্বের মতই গাইতে হবে কুম্ভকর্ণ আলাদা করে এর কোন বর্ণনা দেন নি; কেবল বলেছেন—গীতিপূর্বোক্তবৎ।

## দ্বাদশ প্রবন্ধ—ধন্যবৈকুণ্ঠকুঙ্কুম

ষষ্ঠ সর্গে "পশ্যতি দিশি দিশি···" গীতটি কুম্ভকর্ণের "ধন্যবৈকুণ্ঠকুঙ্কুম" নামক দ্বাদশ প্রবন্ধ। অপরাপর গ্রন্থে "ধন্যবৈকুণ্ঠ" স্থলে "ধৃষ্টবৈকুণ্ঠ" দেখা যায়। কুম্ভকর্ণ "ধন্যবৈকুণ্ঠ" আখ্যাটিরই সমর্থন করেছেন। এই প্রবন্ধ জয়দেব গোণ্ডকিরি রাগে রূপক তালে রচনা করেছিলেন। কুম্ভকর্ণ এটিকে রূপান্বিত করেছেন মালবগৌড় রাগে এবং অড্ড তালে। সঙ্গীতরাজ থেকে এই প্রবন্ধের পরিচয় প্রদান করা হয়েছে :—

মালবীয়ঃ স্মৃতো গৌড়ো রাগস্তালোঽড্ডতালকঃ।
শৃঙ্গারো বিপ্রলম্ভাখ্যো রসো দেবাদিবর্ণনম্ ॥
পদসন্ততিতস্তেনাঃ পাটাঃ স্বরসমুচ্চয়ঃ।
ততঃ পদ্যানি যত্র স্যূর্লয়মধ্যমমানতঃ ॥
স প্রবন্ধবরো জ্ঞেয়ো ধন্যবৈকুণ্ঠকুঙ্কুমঃ ॥

এই প্রবন্ধের প্রতি পদের সঙ্গেই তেনক, পাট এবং স্বরানুষ্ঠান হত বলে মনে হয়। গানটির পরে যে পদ্যাংশ আছে, সেটিও মধ্য লয়ে গীত হত।

## ত্রয়োদশ প্রবন্ধ—স্নিগ্ধমধুসূদনরাসাবলয়

সপ্তম সর্গের প্রথম গীত "কথিতসময়েঽপি হরিরহহ ন যযৌ বনং···" এইটি "স্নিগ্ধমধুসূদন-রাসবলয়" নামক ত্রয়োদশ প্রবন্ধ। চতুর্থ সর্গের "স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্···" এই গীতটিও উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট প্রবন্ধ। তথাপি এখানে কিছু প্রভেদ আছে। এ ক্ষেত্রে রাগ-স্থানগৌড় এবং তাল বর্ণযতি। জয়দেব এই গানটিতে মালব রাগ এবং যতি তাল প্রয়োগ করেছিলেন। সঙ্গীতরাজ গ্রন্থ থেকে কুম্ভকর্ণ এই প্রবন্ধের পরিচয় দিয়েছেন :—

রাগঃ স্যাৎ স্থানগৌড়াখ্যস্তালো বর্ণযতী রসঃ।
শৃঙ্গারো বিপ্রলম্ভাখ্যঃ প্রমদা মদনাকুলা ॥
পঙ্কনামাবলেঃ পাটা গুম্ফিতা যত্র গীতকে।
স্নিগ্ধমধুসূদনোঽয়ং রাসাবলয়নামকঃ।
প্রবন্ধঃ পৃথিবীভর্ত্রা প্রবদ্ধঃ প্রীতয়ে হরেঃ ॥
ইতি স্নিগ্ধমধুসূদনোঽয়ং রাসাবলয়নামা প্রবন্ধস্ত্রয়োদশঃ ॥

এই শ্লোকে "পঙ্কনামাবলি" শব্দের অর্থ স্পষ্ট বোঝা গেল না।

## চতুর্দশ প্রবন্ধ—হরিরমিতচম্পকশেখর

সপ্তম সর্গের দ্বিতীয় গীত "স্মরসমরোচিতবিরচিতবেশা···" কুম্ভকর্ণের "হরিরমিত-চম্পকশেখর" নামক চতুর্দশ প্রবন্ধ। জয়দেব এই গানটিতে বসন্ত রাগ এবং একতাল যোজনা করেছিলেন। কুম্ভ এটিতে শ্রীরাগ এবং দ্রুতমণ্ঠক তাল প্রয়োগ করেছেন। এই সংগীতে পদগুলির সঙ্গে পাট, স্বর এবং তেনকের অনুষ্ঠান করা হ'ত। এ ছাড়া মাঝে মাঝে প্রয়োগ বা গমকযুক্ত আলাপের মত কাজও করা হ'ত। সঙ্গীতরাজ নামক গ্রন্থ থেকে এই প্রবন্ধের পরিচয় দেওয়া হয়েছে :—

শ্রীরাগো যত্র রাগঃ স্যাত্তালস্তু দ্রুতমণ্ঠকঃ।
বর্ণনং বাসুদেবস্য রতিস্তদ্যাত্যয়ে স্ত্রিয়াঃ ॥
পদেভ্যঃ পাটসন্তানং স্বরাস্তেনাস্তথৈব চ।
প্রয়োগশ্চ ভবেৎ যত্র স প্রবন্ধবরঃ স্মৃতঃ ॥

হরিরমিতচম্পকবর্ণেভ্যঃ শেখরাভিধঃ ॥
ইতি হরিরমিতচম্পকশেখরনামা চতুর্দশঃ প্রবন্ধঃ ॥

সালগসূড়পর্যায়ভুক্ত ধ্রুবগীতির "শেখর" এবং "চন্দ্রশেখর" নামক প্রকারভেদের পরিচয় পাওয়া যায়। এই গানটি উক্ত পর্যায়ের অন্তর্গত হওয়াও বিচিত্র নয়।

## পঞ্চদশ প্রবন্ধ—হরিরসমন্মথতিলক

সপ্তম সর্গের তৃতীয় গীত—"সমুদিতমদনে রমণীবদনে ··" কুম্ভকর্ণের "হরিরসমন্মথতিলক" নামক পঞ্চদশ প্রবন্ধ। জয়দেব এই গানটিতে গুর্জরী রাগ এবং একতালী তাল প্রয়োগ করেছিলেন। কুম্ভ এটিতে মহ্লার রাগ এবং দ্রুতমণ্ঠ তাল প্রদান করেছেন। এই গীতটি গাইবার রীতি একই প্রকার অর্থাৎ যথাক্রমে স্বরাবৃত্তি, পাট এবং তেনকের অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট হয়েছে। গানটি দ্রুতলয়ে গেয়। সঙ্গীতরাজ গ্রন্থ থেকে এর পরিচয় উদ্ধৃত হয়েছে :—

দ্রুতমণ্ঠেন তালেন দ্রুতেনৈব লয়েন চ।
মহ্লারে রসরাজে স্যাৎ পদানাং সন্ততেঃ পুনঃ ॥
স্বরগ্রামস্তথা পাটাস্তেনা অপি যথাক্রমম্।
হরিরসমন্মথাদ্যস্তিলকাখ্যঃ প্রবন্ধরাট্ ॥
ইতি হরিরসমন্মথতিলকনামা পঞ্চদশঃ প্রবন্ধঃ ॥

তিলকনামক ধ্রুবগীতির একটি প্রকারভেদও পাওয়া যায়।

## ষোড়শ প্রবন্ধ—নারায়ণমদনায়াস

সপ্তম সর্গের চতুর্থ গীত—"অনিলতরলকুবলয়নয়নেন···" কুম্ভকর্ণের "নারায়ণমদনায়াস" নামক ষোড়শ প্রবন্ধ। জয়দেব এই গীতটি দেশবরাড়ী রাগে এবং রূপক তালে রচনা করেছিলেন। কুম্ভকর্ণ এটিতে বরাটি (বরাড়ী) রাগ এবং বর্ণযতি তাল প্রয়োগ করেছেন। সঙ্গীতরাজ থেকে এই প্রবন্ধের বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে :—

রাগো বরাটিকা যত্র তালো বর্ণযতিস্তথা।
পদানি স্বেচ্ছয়ালাপভূষিতানি যথাদ্যুতি ॥
ততঃ স্বরাশ্চ পাটাশ্চ ততঃ পদ্যানি কানিচিৎ।
ইতি নারায়ণপদান্মদনায়াসনামকঃ ॥
প্রবন্ধঃ ক্ষিতিনাথেন লোকনাথস্য বর্ণিতঃ ॥
ইতি নারায়ণমদনায়াসনামা ষোড়শঃ প্রবন্ধঃ ॥

এই প্রবন্ধে ইচ্ছামত পদগুলিতে আলাপ ও প্রয়োগ আচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর যথানিয়মে স্বর, পাট এবং পদ্যাদির অনুষ্ঠান পরিকল্পিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে "শ্রীজয়দেবভণিতবচনেন। প্রবিশতু হরিরপি হৃদয়মনেন"—এই আভোগ অংশের পর আরও চারটি শ্লোকের রাগসহযোগে আবৃত্তিকেই পদ্যানুষ্ঠান বলে ধরতে হবে। "প্রবন্ধঃ ক্ষিতিনাথেন

লোকনাথস্য বর্ণিতঃ"—এই কথাটিতে "ক্ষিতিনাথ" শব্দটি মহারাজ কুম্ভকর্ণ নিজের প্রতি প্রয়োগ করেছেন এবং "লোকনাথ" শব্দটি নারায়ণ বা বিষ্ণু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেন না, প্রবন্ধটির নামই হচ্ছে "নারায়ণমদনায়াস"। সমগ্র কথাটির অর্থ হচ্ছে এই যে, ক্ষিতিনাথ কুম্ভকর্ণকর্তৃক লোকনাথ নারায়ণবিষয়ক প্রবন্ধটি বর্ণিত হয়েছে।

## সপ্তদশ প্রবন্ধ—লক্ষ্মীপতিরত্নাবলী

অষ্টম সর্গের নাম বিলক্ষলক্ষ্মীপতি। কুম্ভকর্ণ এই সর্গের "রজনীজনিতগুরুজাগর…" গীতটির নাম দিয়েছেন—"লক্ষ্মীপতিরত্নাবলী"। এইটি সপ্তদশ প্রবন্ধ। জয়দেব এটি বেঁধেছিলেন ভৈরবী রাগে এবং যতি তালে। কুম্ভকর্ণ প্রয়োগ করেছেন মেঘ রাগ এবং বর্ণযতি তাল। তদীয় সঙ্গীতরাজ থেকে এই প্রবন্ধের পরিচয় উদ্ধৃত হয়েছে :—

তালো বর্ণযতির্মেঘরাগে দেবাদিবর্ণনম্ ॥
বিপ্রলম্ভাখ্যশৃঙ্গারো রসঃ করুণবেদনম্ ॥
কবিনামাঙ্কিতপদপ্রান্তে পাটস্বরাবলিঃ।
দ্বিত্রান্যথ পদানি স্যুরিতি লক্ষ্মীপতেঃ পুরঃ ॥
রত্নাবলীপ্রবন্ধোঽয়ং নিবদ্ধঃ কুম্ভভূভুজা।
ইতি লক্ষ্মীপতিরত্নাবলীনামা সপ্তদশঃ প্রবন্ধঃ ॥

এই প্রবন্ধের ভণিতাযুক্ত আভোগ অর্থাৎ "শ্রীজয়দেবভণিতরতিবঞ্চিতখণ্ডিতযুবতিবিলাপম্। শৃণোতু সুধামধুরং বিবুধা বিবুধালয়তোঽপি দুরাপম্ ॥—এই অংশের পর পাট এবং স্বরের অনুষ্ঠান নির্ধারিত হয়েছে। এর পরে এই সর্গে আরও দুটি শ্লোক বা পদ রয়েছে। এই কারণেই কুম্ভকর্ণ বলছেন "দ্বিত্রান্যথ পদানি স্যুঃ"।

## অষ্টাদশ প্রবন্ধ—অমন্দমুকুন্দ

নবম সর্গের নাম—মুগ্ধমুকুন্দ। কুম্ভকর্ণ এই সর্গের "হরিরভিসরতি বহতি মধুপবনে…" প্রবন্ধটির নাম দিয়েছেন—"অমন্দমুকুন্দ"। এটি অষ্টাদশ প্রবন্ধ। জয়দেবপ্রদত্ত সুর হচ্ছে গুর্জরী (পাঠভেদে রামকিরি), তাল যতি। কুম্ভকর্ণ অর্পণ করেছেন নট্টরাগ এবং তৃতীয় তাল। এর পরিচয়ও সঙ্গীতরাজ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে দেওয়া হয়েছে :—

নট্টরাগস্তৃতীয়াখ্যস্তালো মধ্যে কচিৎ কচিৎ।
পদানাং শোভয়ালাপগুম্ফনাং গানহেতুকাম্ ॥
অন্তে পাটাঃ স্বরাস্তেনান্তদন্তে পদ্যগুম্ফনং।
পদ্যামন্দমুকুন্দাখ্যমকরন্দাভিধানবৎ ॥
প্রবন্ধঃ প্রীতয়ে গীতঃ শ্রীপতেঃ কুম্ভভূভুজা ॥
ইতি শ্রীঅমন্দমুকুন্দোনামাষ্টাদশঃ প্রবন্ধঃ ॥

এই প্রবন্ধেও পদগুলির মধ্যে কখনো কখনো আলাপের আচরণ নির্দিষ্ট হয়েছে। আভোগের

অন্তে অর্থাৎ জয়দেবের ভণিতাযুক্ত পদের পরে পাট, স্বর, তেন প্রভৃতির অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট হয়েছে। এর পরে কয়েকটি পদ্য বা শ্লোক গ্রন্থিত হবে, এমন কথাও বলা হয়েছে। এই সর্গে গীতটির পরে তিনটি শ্লোক গ্রন্থিত হয়েছে।

এই সব গীতের পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতি গীতের শেষের দিকে বাজনার বোল, স্বরাবৃত্তি প্রভৃতি যোগ করে গানটিকে বেশ জমিয়ে তোলা হত; তার পরে আবার সুরসহযোগে শেষের কয়েকটি শ্লোক আবৃত্তি করে ধীরভাবে সমগ্র সর্গটির গায়ন সমাপ্ত করা হত।

অতঃপর কুম্ভ বলছেন—"যদি কৌতুকিনো গানে সঙ্গীতে চাতুরী যদি। রসিকাঃ কুম্ভকর্ণস্থ শৃণ্বন্তু বুধমত্তমাঃ॥" এর সঙ্গে প্রথম সর্গের তৃতীয় শ্লোকটি স্মরণীয়। এই শ্লোকে জয়দেব বলছেন—

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো যদি বিলাসকথাসু কুতূহলম্।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্॥

## একোনবিংশ প্রবন্ধ—চতুরচতুর্ভুজরাগরাজিচন্দ্রোদ্যোত

দশম সর্গের নাম চতুর্ভুজ। এই সর্গের "বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী…" গানটির নাম দেওয়া হয়েছে—"চতুরচতুর্ভুজরাগরাজিচন্দ্রোদ্যোত"। এইটি একোনবিংশ প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের "প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্। সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং দেহি মুখকমলমধুপানম্॥" এই অংশটুকু ধ্রুব। যথানিয়মে এইটি প্রথমে গেয়ে গানটি ধরতে হবে এবং প্রতি পদের পরেও এটি আবৃত্তি করতে হবে। জয়দেব এই গীতের সুর দিয়েছিলেন দেশবরাড়ী এবং তাল যোজনা করেছিলেন অষ্টতালী। কুম্ভকর্ণ বর্ণযতি তাল প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু তিনি ক্রমান্বয়ে আঠারোটি রাগের গুম্ফন করে এই গীতটিতে বৈচিত্র্য প্রদান করেছেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি বলছেন—"ললিতাপি পদ্যরচনা ন ধাতুযোগাদৃতে বিভাতি শুভা। ইতি কুম্ভকর্ণনৃপতির্গায়তি তাং গীতগোবিন্দে।" লালিত্য-গুণযুক্ত পদ্য স্বতই গীতধর্মী—তাকে ধাতু বা কলিতে ভাগ করে সঙ্গীতে রূপায়িত না করলে যেন মন ভরে না। এই কারণে নির্দিষ্ট গীতগুলি ছাড়া অপর কবিতাগুলিকেও কুম্ভকর্ণ গীতরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সঙ্গীতরাজ গ্রন্থ থেকে কুম্ভকর্ণ এই প্রবন্ধের পরিচয় দিচ্ছেন :—

তালো বর্ণযতী রাগাঃ ক্রমাদষ্টাদশ স্মৃতাঃ।
মধ্যমাদিশ্চ ললিতো বসন্তো গুর্জরী তথা॥
ধানসী ভৈরবো গোণ্ডকৃতির্দেশাখ্যিকাপি চ।
মালবশ্রীশ্চ কেদারমালবীয়াদিগৌণ্ডকৌ॥
স্থানগৌণ্ডশ্চ শ্রীরাগো মহ্লারশ্চ বরাটিকা।
মেঘরাগশ্চ জত্রাবদ্ধোরণী নিয়তা ইমে॥

যাবদ্রাগং পদানি স্যুঃ প্রান্তে পাটস্বরাণি তু।
ক্বচিৎ ক্বচিৎ গতালাপভূষিতানি যথারুচি॥
মিথঃ প্রিয়োক্তিসম্ভারবিপ্রলম্ভরসানি চ।
যত্র স্যাৎ স প্রবন্ধোঽয়ং রাগরাজিবিরাজিতঃ॥
ইতি চতুরচতুর্ভুজরাগরাজিচন্দ্রোদ্ভতনামা একোনবিংশঃ প্রবন্ধঃ॥

এই বর্ণনায় অষ্টাদশ রাগের কথা বলা হলেও ষোলটি রাগের পরিচয়ই বিশেষরূপে জানা যায়। বাকি দুটি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। এই ষোলটি রাগ হচ্ছে—মধ্যমাদি, ললিত, বসন্ত, গুর্জরী, ধানসী, ভৈরব, গোণ্ডকৃতি, দেশাক্ষ, মালবশ্রী, কেদার, মালবগৌণ্ডক, স্থানগৌণ্ড, শ্রী, মহ্লার, বরাটিকা, মেঘ। অপর দুটি রাগের একটি সম্ভবত "ভদ্রাবং" এবং অপরটি "ধোরণী"। ধোরণী—এই নামটি ২২ সংখ্যক প্রবন্ধে পাওয়া যাচ্ছে। এই দুটি রাগ খুবই স্বল্পপরিচিত।

এই প্রবন্ধেও যথারীতি পাট, স্বর, আলাপ প্রভৃতির অবকাশ রাখা হয়েছে। পরবর্তী শ্লোকগুলি স্থিতলয়ে গান করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই গীত থেকেই কুম্ভকর্ণ-পরিকল্পিত গীতগোবিন্দ প্রবন্ধের শেষাংশ নানা বৈচিত্র্যে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এটিতে বহু রাগের গুম্ফন করা হয়েছে—এর পরবর্তী গীতটিতে বহু তালের বিচিত্র সংযোগ সংঘটিত হয়েছে।

## বিংশতি প্রবন্ধ—শ্রীহরিতালরাজিজলধরবিলসিত

একাদশ সর্গের "বিরচিতচাটুবচনরচনং···" গীতটির নাম দেওয়া হয়েছে "শ্রীহরিতাল-রাজিজলধরবিলসিত" প্রবন্ধ। জয়দেব এটিতে বসন্ত রাগ এবং যতি তাল প্রয়োগ করেছিলেন। কুম্ভ নন্দ নামক একটি রাগ প্রয়োগ করেছেন। আগের প্রবন্ধটিতে বহু রাগ মিশ্রণের জন্য তার নামের মধ্যে "রাগরাজি" শব্দের উল্লেখ ছিল, এই প্রবন্ধে বহু তাল সংযোজনার জন্য এই নামের সঙ্গে "তালরাজি" শব্দের উল্লেখ রয়েছে। সঙ্গীতরাজ গ্রন্থ থেকে এর পরিচয় উদ্ধৃত হয়েছে :—

আদিতালঃ প্রথমতঃ প্রতিমণ্ঠস্ততঃ পরম্।
চতুর্মাত্রাহ্বমণ্ঠশ্চ তুর্যঃ স্যাদড্ডতালকঃ॥
তালো বর্ণযতিঃ পশ্চান্নবমাত্রিকমণ্ঠকঃ।
নিঃসারুশ্চ তথা ঝম্পা দ্রুতমণ্ঠশ্চ রূপকঃ॥
প্রতিতালস্ত্রিপুটক একতালীতি সংজ্ঞয়া।
ত্রয়োদশ ক্রমাৎ তালাঃ প্রতিতালং পদানি চ॥
যথা শাতালপ্তিযুক্তি তাবন্ত্যেব ততঃ পরম্।
কাহলী তুণ্ডকিন্তৌ চ ভুক্তা চ শৃঙ্গশঙ্খকৌ॥

পটহশ্চ হুড়ুক্কং চ মুরজঃ করটাপি চ।
রুঞ্জা চ ডমরুঢক্কা পাটা এতৎসমুদ্ভবাঃ॥
নিঃসারৌ পটহো ঢক্কা মর্দলস্ত্রিবলী তথা।
করটেতি তথৈতস্যাং প্রধানাক্ষরযোজনা॥
একতাল্যা ডক্কলী চ ত্রিবলী দুন্দুভিস্তথা।
ঘটশ্চতুর্বর্ণ্যকঃ স্যাদধিকা পাটসঙ্গতিঃ॥
প্রতিতালং প্রয়োগোঽপি রাগো নন্দো নিগদ্যতে।
শৃঙ্গারো বিপ্রলম্ভাখ্যো রস উত্তমনায়কঃ॥
দূতীসংবাদকথনং নায়িকায়ামিহেষ্যতে।
এতৎ স্যাং লক্ষণং যচ্চ তালরাজিরসঃ স্মৃতঃ॥
প্রবন্ধঃ কুম্ভভূপেন হরিপ্রবণচেতসা॥
ইতি শ্রীহরিতালরাজিজলধরবিলসিতনামা বিংশতিতমঃ প্রবন্ধঃ

পদগুলিতে ক্রমান্বয়ে তেরটি তাল যোজিত হয়েছে। তালগুলি হচ্ছে—আদি, প্রতিমণ্ঠ, চতুর্মাত্রাযুক্ত মণ্ঠ, অড্ড, বর্ণযতি, নবমাত্রিক মণ্ঠ, নিঃসারুক, ঝম্পা, দ্রুতমণ্ঠ, রূপক, প্রতিতাল, ত্রিপুটক এবং একতালী। এর মধ্যে যেখানে শোভা পায়, সেখানে রাগালাপ যোজনা করবার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

গীতশেষে বিবিধ যন্ত্রসহযোগে বিচিত্র তালের সমারোহ সৃষ্টি করা হয়েছে। যন্ত্রাদির মধ্যে বংশীজাতীয় বাদ্য হচ্ছে—কাহলী, তুণ্ডকিনী, শৃঙ্গ এবং শঙ্খ। চর্মবাদ্য—পটহ, হুড়ুক্কা, মুরজ, করটা, রুণ্ডা ( রুঞ্জা ), ডমরু, ঢক্কা, ঘট, ত্রিবলী এবং দুন্দুভি। প্রথমে কাহলী, তুণ্ডকিনী, শৃঙ্গ এবং শঙ্খের সঙ্গে পটহ, হুড়ুক্কা, মুরজ, করটা, রুণ্ডা এবং ডমরু পাটাক্ষর সমেত বাজাবার ব্যবস্থা হয়েছে। এখানে "কাহলীতুণ্ডকিন্যৌ চ ভুক্তা চ শৃঙ্গশঙ্খকৌ"—এই লাইনে "ভুক্তা" শব্দটি "মুক্তা" হবে বলে মনে হয়। "ভুক্তা" নামক কোন বাদ্য নেই। শৃঙ্গ ও শঙ্খ সম্বন্ধে "মুক্তা" শব্দটি প্রযোজ্য। কেন না, যখন সবগুলি ছিদ্র থেকে আঙুল তুলে অর্থাৎ মুক্তভাবে বাজানো হয়, তখন সেই প্রক্রিয়াকে বলে "মুক্তা"। এ স্থলে শৃঙ্গ এবং শঙ্খের আওয়াজ সঙ্কুচিত না করে মুক্তভাবে প্রকাশ করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর পর নিঃসারুক তাল অনুসারে পটহ, ঢক্কা, মর্দল, ত্রিবলী এবং করটা—এই বাদ্যগুলি বাজবে।

এখানে "প্রধানাক্ষরযোজনা" শব্দটির একটি তাৎপর্য আছে। বোলাবলী নামক এক প্রকার পটহবাদ্যবিধিতে প্রধানাক্ষরযোজনার নিয়ম ছিল। পটহজাতীয় এক একটি বাদ্যের এক একটি প্রধান স্বর আছে, সেটি অক্ষর সহযোগে বোঝানো হয়। যেমন পটহের দেং দেং ধ্বনিটি তার প্রধান স্বর। এই আওয়াজটির বারম্বার ঘোষণাকে বলে প্রধানাক্ষর-যোজনা। এই রকম হুড়ুক্কাযোগে ঝেং ঝেং ধ্বনি, ঢক্কা বা মর্দলে থোং থোং ধ্বনি, ত্রিবলীতে দোং দোং এবং করটায় টেম্ টেম্ ধ্বনির বারম্বার প্রয়োগকেই বলা হয় প্রধানাক্ষরযোজনা[১]। এ ক্ষেত্রে মহারাজ কুম্ভকর্ণ এই প্রক্রিয়াটির প্রয়োগ করেছেন।

---

১. সঙ্গীতরত্নাকর, তালাধ্যায় পৃ. ৪১১. শ্লোক ১০৮, আড্যায়ার সংস্করণ

অতঃপর একতালী তাল অবলম্বনে ঢক্কলী, ত্রিবলী, দুন্দুভি এবং ঘটবাদ্য বাজানো হবে। "ঘটশ্চতুর্বর্ণ্যকঃ" বলতে সম্ভবত এখানে চার শ্রেণীর ঘটবাদকের কথা বলা হয়েছে। এই চারটি শ্রেণী হচ্ছে—বাদক, মুখরী, প্রতিমুখরী এবং গীতানুগ[১]। অথবা শুদ্ধ, কূট, কূটমিশ্র এবং খণ্ডপাট[২]—এইগুলিও চতুর্বর্ণ্য অর্থে প্রযুক্ত হতে পারে। শাস্ত্রানুসারে মর্দলে যে সব পাটবর্ণের অনুষ্ঠান করা হয়, ঘটবাদ্যেও সেগুলি প্রযোজ্য। এই উপলক্ষে শার্ঙ্গদেব বলছেন—"কথিতাঃ পাটবর্ণা যে মর্দলে তে ঘটে মতাঃ"[৩]।

## একবিংশ প্রবন্ধ

"মঞ্জুতরকুঞ্জতলকেলিসদনে···" গানটি একবিংশ প্রবন্ধ। জয়দেব এই প্রবন্ধের রাগ নির্দেশ করেছেন—দেশবরাড়ী এবং তাল রূপক। কুম্ভ কেবলমাত্র বরাডী রাগেরই উল্লেখ করেছেন। নির্ণয়সাগর প্রেস থেকে প্রকাশিত রসিকপ্রিয়া টীকা-সমন্বিত গীতগোবিন্দ গ্রন্থের ১৪৬ পৃষ্ঠার পাদটীকায় বলা হয়েছে—"রাগমঠতালাভ্যাং" "রাগাড়বতালাভ্যাং" ইতি পাঠৌ। এর মধ্যে একটি যে মঠতাল, সেটি স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। আড়ব নামক তালের পরিচয় উদ্ঘাটন করা গেল না। এই নামের কোন তাল যদি না থাকে, তবে এটি অড্ড-তালেরই অপভ্রংশ বলে মনে করি। এই প্রবন্ধের সঙ্গীতাংশের বিস্তারিত কোন পরিচয় কুম্ভ দেন নি, কেমলমাত্র এইটুকু বলেছেন যে, এই অষ্টপদীতে উদ্গ্রাহ অপেক্ষা ধ্রুবেরই বাহুল্য অধিক। এর সঙ্গে এও বলছেন—"তত্রাপি চ প্রতিপদমন্তিমং, খণ্ডং পদান্তরাপেক্ষয়া নবং নবমেতি বোদ্ধব্যম্" অর্থাৎ তথাপি প্রতি পদের অন্তিম খণ্ড পদান্তর অপেক্ষা নতুনভাবে রচিত হবে। এই ভাবে প্রতি পদেরই এক একটি অভিনবত্ব থাকবে এবং বৈচিত্র্য পরিস্ফুট হবে।

## দ্বাবিংশ প্রবন্ধ—সানন্দগোবিন্দরাগশ্রেণীকুসুমাভরণ

একাদশ সর্গের "রাধাবদনবিলোকন···" এই গীতটি হচ্ছে কুম্ভকর্ণের সানন্দগোবিন্দরাগ-শ্রেণীকুসুমাভরণ নামক দ্বাবিংশ প্রবন্ধ। এই সর্গটির নাম "সানন্দদামোদর"। এর সঙ্গে প্রবন্ধের নামেরও মিল রাখা হয়েছে। জয়দেব এই গীতে বরাটী এবং যতি তালের প্রয়োগ করেছিলেন। কুম্ভ এই প্রবন্ধে রাগ এবং তালের বৈচিত্র্য প্রদর্শন করেছেন। ইতিপূর্বে দুটি প্রবন্ধে ভিন্নভাবে বহু রাগ এবং বহু তালের সমাবেশ ঘটেছে। এই প্রবন্ধটিতে কুম্ভ বিভিন্ন রাগ এবং বিভিন্ন তালের একত্র সমাবেশ ঘটিয়েছেন। কুম্ভকর্ণ এই প্রবন্ধের পরিচয় দিয়েছেন—

---

১. সঙ্গীতরত্নাকর—পৃ. ৪৫৯ শ্লোক ১০৩৯,
২. " —পৃ. ৪৫৭ শ্লোক ১০৩৫, ১০৩৬
৩. " —পৃ. ৪৭২ শ্লোক ১০৮৬, অ্যাডায়ার সংস্করণ

ক্রমেণ নট্টকেদারশ্রীরাগস্থানগৌড়কাঃ।
ধোরণী মালবীয়শ্চ বরাটী মেঘরাগকঃ।
মালবশ্রীর্দেবশাখো গৌণ্ডকুচ্ছাথ ভৈরবী।
ধন্নাসিকা বসন্তশ্চ গুর্জরী চ মহ্লারকঃ॥
ললিতঃ সপ্তদশমো রাগাস্তাবন্তি চ ক্রমাৎ।
পদানি তেষু তালাঃ স্যুরিতস্তন্নাম কীর্ত্যতে॥
আদ্যত্রিসপ্তদশমদ্বাদশো দ্রুতমণ্ঠকাঃ।
দ্বিতীয়ে নবমে চৈকাদশে চৈব ত্রয়োদশে॥
পদে পঞ্চদশে সপ্তদশে রূপক ঈরিতঃ।
চতুর্থে প্রতি তালব্যা দ্রুতালঃ পঞ্চমে স্মৃতঃ॥
ত্রিপুটঃ ষষ্ঠাষ্টময়োঃ স্যাদ্দ্রুতপ্রতিমণ্ঠকঃ।
চতুর্দশে ষোড়শে চ ভদ্রঃ স্যাৎ প্রতিতালকম্॥
মধ্যমাদৌ পুনর্মুক্তিঃ শৃঙ্গারঃ স্যাভিলাষয়োঃ।
স্ত্রীপুংসয়োরুত্তমস্য নায়কস্যোপবর্ণনম্॥
কৈশিকী রীতিমাশ্রিত্য পদানাং স্বস্বনামতা।
ছন্দঃ স্বেচ্ছাবিরচিতং রূপকে যত্র দৃশ্যতে॥
স রাগশ্রেণিনামায়ং প্রীতিকৃৎকমলাপতেঃ।
ইতি সানন্দগোবিন্দরাগশ্রেণিকুসুমাভরণ নামা
দ্বাবিংশতিতমঃ প্রবন্ধঃ॥

এই প্রবন্ধের প্রতি পদ অনুসারে ক্রমান্বয়ে সতেরটি রাগ প্রযুক্ত হয়েছে। প্রবন্ধটিতে কিন্তু ষোলটি পদ রয়েছে। কুম্ভকর্ণের প্রদর্শিত রীতি অনুসারে ধ্রুব অংশটি প্রবন্ধের প্রথমে আচরণ করতে হয়। এই হিসাবে আর একটি বেশী ধ্রুব যোজিত হয়ে সতেরটি পদে প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ হচ্ছে। উপরোক্ত শ্লোক অনুসারে কোন্ পদে কোন্ রাগ এবং কোন্ তাল যোজিত হয়েছে, সেটি নিম্নোক্তরূপে দেখান গেল :—

| | | | রাগ | তাল |
|---|---|---|---|---|
| ১। | ধ্রুব। | হরিমেকরসং··· | নট্ট | দ্রুতমণ্ঠক |
| ২। | পদ। | রাধাবদন··· | কেদার | রূপক |
| ৩। | ধ্রুব। | হরিমেকরসং··· | শ্রী | দ্রুতমণ্ঠক |
| ৪। | পদ। | হারমমলতর··· | স্থানগৌড় | প্রতিতাল |
| ৫। | ধ্রুব। | হরিমেকরসং··· | ধোরণী | দ্রুতাল ( দ্বিতাল বা দ্বিতীয় তাল? ) |
| ৬। | পদ। | শ্যামলমৃদুল··· | মালব | ত্রিপুট |
| ৭। | ধ্রুব। | হরিমেকরসং··· | বরাটী | দ্রুতমণ্ঠক |
| ৮। | পদ। | তরলদৃগঞ্চল··· | মেঘ | ত্রিপুট |

| | | | রাগ | তাল |
|---|---|---|---|---|
| ৯। | ধ্রুব। | হরিমেকরসং··· | মালবশ্রী | রূপক |
| ১০। | পদ। | বদনকমল··· | দেবশাখ | দ্রুতমণ্ঠক |
| ১১। | ধ্রুব। | হরিমেকরসং··· | গৌণ্ডকৃতি | রূপক |
| ১২। | পদ। | শশিকিরণ··· | ভৈরবী | দ্রুতমণ্ঠক |
| ১৩। | ধ্রুব। | হরিমেকরসং··· | ধন্নাসিকা | রূপক |
| ১৪। | পদ। | বিপুলপুলকভব··· | বসন্ত | দ্রুতপ্রতিমণ্ঠক |
| ১৫। | ধ্রুব। | হরিমেকরসং··· | গুর্জরী | রূপক |
| ১৬। | পদ। | শ্রীজয়দেব··· | মল্লার | প্রতিতাল |
| ১৭। | ধ্রুব। | হরিমেকরসং··· | ললিত | রূপক |

কুম্ভকর্ণ বলেছেন—গানটির পুনর্মুক্তি হবে মধ্যমাদি রাগে। সম্ভবতঃ এর অর্থ এই যে, প্রবন্ধের পরবর্তী শ্লোকগুলি মধ্যমাদি রাগ আশ্রয় করে গাইতে হবে। উক্ত প্রবন্ধে যে তালসমূহ কুম্ভকর্ণ নির্দেশ করেছেন, সেগুলিই যে কেবলমাত্র প্রয়োগ করা উদ্দেশ্য, এমন নয়। তিনি বলছেন, রূপকের মত গীতে শিল্পী ইচ্ছামত রাগ তাল পরিবর্তন করে নূতনত্ব সৃষ্টি করতে পারবেন। এই "রূপক"[১] একটি বিশেষ শ্রেণীর সঙ্গীত। এতে পদ, কলির বিন্যাস, তাল প্রভৃতি ইচ্ছানুসারে পরিবর্তন করে নূতন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হত।

দ্বাদশ সর্গে গীতগোবিন্দ কাব্যের পরিসমাপ্তি হয়েছে। এই সর্গে বাকি ছয়টি প্রবন্ধ যোজিত হয়েছে।

## ত্রয়োবিংশ প্রবন্ধ—মধুরিপুমোদবিত্তাধরলীলা

দ্বাদশ সর্গের প্রথম প্রবন্ধ "কিসলয়শয়নতলে···" কুম্ভকর্ণের "মধুরিপুমোদবিত্তাধরলীলা" নামক ত্রয়োদশ প্রবন্ধ। জয়দেব এই প্রবন্ধটি বিভাস রাগ এবং একতালী তালে রচনা করেছিলেন। কুম্ভ এটিতে দেবশাল রাগ প্রয়োগ করেছেন; তাল যোজনা করেছেন দুটি—বর্ণযতি এবং প্রতিতাল। এই প্রবন্ধের পরিচয়:—

পদানাং দশকং যত্র তালে বর্ণযতৌ ভবেৎ।
ধ্রুবং প্রতিপদং গেয়ং কবিনামাঙ্কিতাৎ পদাৎ॥
গীতালাপান্তথাশব্দং প্রতিতালে ততঃ পরম্।
পাটান্তেনাঃ স্বরাশ্চৈব শৃঙ্গারো রস উত্তমঃ॥
দেবশাখাভিধো রাগঃ প্রবন্ধে সম্প্রদৃশ্যতে।
শ্রীবিত্তাধরলীলাখ্যঃ শ্রীপতিপ্রীতিকারকঃ॥
ইতি মধুরিপুমোদবিত্তাধরলীলা নাম ত্রয়োবিংশঃ প্রবন্ধঃ॥

---

১. সঙ্গীতরত্নাকর, প্রবন্ধাধ্যায় শ্লোক ৩৩১-৩৫, পৃ. ৩১৯-২০

এই প্রবন্ধটিতেও পূর্বের মত ধ্রুবসমেত সতেরটি পদ আছে। এর মধ্যে প্রথম দশটি পদ বর্ণযতি তালে গাইতে হবে। পরবর্তী পদগুলি প্রতিতালে গাইবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিতালে আসবার পূর্বে আলাপসংযোগ করা হয়েছে। প্রবন্ধের শেষে যথাবিধি পাট এবং তেনক আচরণ বিধেয়।

এর পরবর্তী চারটি শ্লোকের প্রত্যেকটিকে কুম্ভকর্ণ এক একটি প্রবন্ধে পরিণত করেছেন। এই গীতগুলির কোন ধ্রুব নেই। আসলে এইগুলি রূপকশ্রেণীর অন্তর্গত। জয়দেব এই শ্লোকগুলিতে কোন রাগ নির্দেশ করেন নি।

## চতুর্বিংশ প্রবন্ধ—সুরতারম্ভচন্দ্রহাস

"প্রত্যূহঃ পুলকাঙ্কুরেণ···" এই শ্লোকটি কুম্ভকর্ণের "সুরতচন্দ্রহাস" নামক চতুর্বিংশ প্রবন্ধ। এই শ্লোকে দেবশাখ রাগ এবং জয়মঙ্গল তাল প্রয়োগ করা হয়েছে। কুম্ভকর্ণ এর বর্ণনা দিয়েছেন :—

জয়মঙ্গলতালেন পদ্যং শৃঙ্গারনির্ভরম্।
গীতাঃ পাটাঃ স্বরাস্তেনা উচ্যন্তে যত্র রূপকে ॥
দেবশাখাভিধে রাগে সুরতারম্ভনামতঃ।
চন্দ্রহাসপ্রবন্ধোঽয়ং প্রবন্ধঃ প্রীতিকুম্ভরেঃ ॥
ইতি সুরতারম্ভচন্দ্রহাসনামা চতুর্বিংশপ্রবন্ধঃ ॥

পূর্বোক্ত রূপকের মত এ ক্ষেত্রেও গীতাংশ, পাট, স্বর, তেন প্রভৃতি ইচ্ছামত সাজিয়ে গাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

## পঞ্চবিংশ প্রবন্ধ—কামিনীহাস

তার পরের শ্লোক—"দোর্ভ্যাং সংযমিতঃ···" কুম্ভের "কামিনীহাস" নামক পঞ্চবিংশ প্রবন্ধ। এই গীতটিতে গৌড়ীরাগ এবং বিজয়ানন্দ তাল প্রয়োগ করা হয়েছে। এতেও পদ্য, পাট, স্বর এবং তেন সংযোগ করা হয়েছে। এর বর্ণনা :—

বিজয়ানন্দতালেন গৌড়ীরাগে বিরচ্যতে।
পদ্যং পাটাঃ স্বরাস্তেনা লীলা নায়কসম্ভবা ॥
শৃঙ্গারকৈশিকী রীতিঃ কামতৃপ্তিপুরঃসরঃ।
কামিনীহাসনামোঽয়ং প্রবন্ধঃ পরিকীর্তিতঃ ॥
ইতি কামতৃপ্তিকামিনীহাসনামা পঞ্চবিংশতিতমঃ প্রবন্ধঃ ॥

## ষড়্বিংশ প্রবন্ধ—পৌরুষরসপ্রেমবিলাস

পরের শ্লোক—"বামাঙ্কে ( অথবা মারাঙ্কে ) রতিকেলিসংকুল···" কুম্ভকর্ণের "পৌরুষরস-প্রেমবিলাস" নামক ষড়্বিংশ প্রবন্ধ। এটি কর্ণাটবঙ্গাল রাগ এবং জয়শ্রী তালে গেয়। এই গীতেও যথারীতি পদ্য, পাট, স্বর এবং তেন সংযোজিত হয়েছে। এর পরিচয় :—

জয়শ্রীসংজ্ঞতালেন পদ্যং পাটাঃ স্বরাস্তথা।
স্তেনাশ্চ যত্র বধ্যন্তে সম্ভোগে রস উত্তমে॥
রাগে কর্ণটবঙ্গালে ( কর্ণাটবঙ্গালে ? ) স পৌরুষরসাৎ পরঃ।
প্রেম্না বিলাসনামায়ং প্রবন্ধো মাধবপ্রিয়ঃ॥
ইতি পৌরুষরসপ্রেমবিলাসনামা ষড়্‌বিংশঃ প্রবন্ধঃ॥

## সপ্তবিংশ প্রবন্ধ—কামাদ্ভুতাভিনবমৃগাঙ্কলেখা

পরের শ্লোক—"তস্যাঃ পটলপাণিজাঙ্কিতমুরো…" কুম্ভকর্ণের "কামাদ্ভুতাভিনবমৃগাঙ্কলেখা" নামক সপ্তবিংশ প্রবন্ধ। এটিতে মরুকৃতি রাগ এবং যতি তাল প্রযুক্ত হয়েছে। এতেও পদ্য, পাট, স্বর এবং তেন প্রযুক্ত হয়েছে। তেন অংশের পর আলাপও সংযোজিত হয়েছে। এর বর্ণনা :—

যতিতালেন তালেন পদ্যং পাটস্বরাস্তথা।
স্তেনাস্তদন্ত আলাপঃ শৃঙ্গারঃ প্রেমনির্ভরঃ॥
রাগো মরুকৃতির্যত্র স প্রবন্ধো নিগদ্যতে।
কামাদ্ভুতাভিনবতা মৃগাঙ্কলেখাভিধানতঃ॥
ইতি কামাদ্ভুতাভিনবমৃগাঙ্কলেখাভিধঃ সপ্তবিংশঃ প্রবন্ধঃ॥

পরবর্তী আরও দুটি শ্লোক "ব্যাকোশ ( অথবা ব্যালোলঃ ) কেশপাশস্তরলিতমলকৈঃ…" এবং "ঈষন্মীলিতদৃষ্টি…" প্রবন্ধে পরিণত না হলেও সুরে রূপায়িত হয়েছে; কুম্ভকর্ণ টীকায় বলছেন—"স্থিতময়ং গানম্"।

## অষ্টবিংশ প্রবন্ধ—শ্রীসুপ্রীতপীতাম্বরতালশ্রেণী

অতঃপর যে গীতটি আছে, এইটিই গীতগোবিন্দের শেষ প্রবন্ধ। জয়দেব এই গীতে রামকিরী রাগ এবং যতি তাল প্রয়োগ করেছিলেন। কুম্ভ গোণ্ড রাগ এবং বহুতাল সংযোজিত করেছেন।

"কুরু যদুনন্দন…" এই অষ্টবিংশতিতম প্রবন্ধের নাম—"শ্রীসুপ্রীতপীতাম্বরতালশ্রেণী"। জয়দেব দ্বাদশ সর্গের নাম দিয়েছিলেন—"সুপ্রীতপীতাম্বর"। এই নামের সঙ্গে মিলিয়ে উক্ত প্রবন্ধের নামকরণ করা হয়েছে। আমরা ইতিপূর্বে তালরাজি প্রবন্ধের পরিচয় পেয়েছি, কুম্ভকর্ণ এটির আখ্যা দিচ্ছেন তালশ্রেণী। এর বর্ণনা :—

আদিতালাস্তথা পঞ্চ হয়বক্ত সমুদ্ভবাঃ।
প্রতিমঠশ্চতুর্মাত্রো মঠশ্চৈবাড্ডতালকঃ॥
তালো বর্ণযতিশ্চৈব জয়মঙ্গলসংজ্ঞিতঃ।
বিজয়ানন্দনামা চ জয়শ্রীসংজ্ঞকঃ পরঃ॥

প্রতিতালং পদাদি স্যুঃ পাঠান্তদ্বুভয়ং তথা।
মধ্যে মধ্যে যথাশোভালপ্তিযুক্তির্বিশেষবৎ ॥
বিশেষতো বর্ণয়তৌ যদা[১] শ্রীসংজ্ঞিকোঽপি চ।
তেনকাঃ স্যুঃ পদস্থানে প্রতিতালেন বেশ্যতে ॥
মুক্তিপাদা[২]—ক্ষরৈর্যু ক্তৈরালাপেন পুরস্কৃতৈঃ।
পাদান্তেব ষোড়শ বৈ তালা একোনবিংশতিঃ ॥
গোণ্ডঃ স্যাদ্দেশতালাদিরাগঃ সর্বপদাশ্রয়ঃ।
ধীরোদাত্তগুণৈর্যুক্তো বর্ণ্য উত্তমনায়কঃ ॥
ছন্দঃ স্যাৎ স্বেচ্ছয়া বন্ধং সমানাদিগুণা দৃশঃ ॥
ইতি শ্রীসুপ্রীতপীতাম্বরতালশ্রেণীনামা অষ্ট বিংশঃ প্রবন্ধঃ ॥

এই প্রবন্ধে প্রতিপদে প্রযুক্ত পর পর ন'টি তালের উল্লেখ করা হয়েছে—আদি, পঞ্চ, প্রতিমণ্ঠ, অড্ড, বর্ণযতি, জয়মঙ্গল, বিজয়ানন্দ, জয়শ্রী। প্রত্যেকটি পদের সঙ্গে পাট আচরিত হবে। মধ্যে মধ্যে শোভন ভাবে আলাপ যোজিত হবে। বিশেষ করে বর্ণযতি এবং জয়শ্রী তালযুক্ত পদের সঙ্গে তেনক অনুষ্ঠিত হবে। পরিশেষে পাটাক্ষর আচরণের পর কিঞ্চিৎ আলাপ অনুষ্ঠানপূর্বক প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি হবে। কুম্ভকর্ণ বলছেন, সবশুদ্ধ ষোলটি পদ এবং উনিশটি তাল এতে যোজিত হবে। প্রতিপদের শেষে ধ্রুবাবৃত্তি ধরলে এতে ষোলটি পদ হয়। উনিশটি তালের মধ্যে ন'টি উল্লিখিত হয়েছে, বাকিগুলি সম্ভবত শিল্পীর ইচ্ছানুসারে প্রযুক্ত হবে, কেন না, কুম্ভকর্ণ এও বলছেন যে, গোণ্ডরাগটি সর্বপদাশ্রিত হলেও বিবিধ দেশী তাল বিভিন্ন পদে প্রযুক্ত হবে। শিল্পীর ইচ্ছানুসারেই যে ছন্দ প্রবর্তিত হবে, এ কথাও তিনি এই বর্ণনায় জানিয়ে দিয়েছেন।

এই গীতের পর যে কটি শ্লোক আছে, তার মধ্যে—"পর্যঙ্কীকৃতনাগনায়কফণা…"এই শ্লোকটি নির্ণয়সাগর-প্রকাশিত কুম্ভের গীতগোবিন্দ গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এ ছাড়া "ইত্থং কেলিততীবিহৃত্য…"এই শেষ শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়। এ সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য রয়েছে—অয়ং শ্লোকঃ প্রক্ষিপ্ত ইতি ভাতি। আদর্শপুস্তকান্তরেষ্বদর্শনাৎ।

রসিকপ্রিয়া টীকায় বর্ণিত "রতিসুখসারে…" এবং "মঞ্জুতর কুঞ্জতল…"এই দুটি প্রবন্ধ ব্যতীত আর সবগুলিরই এক একটি নাম পাওয়া যাচ্ছে। সঙ্গীতরাজ গ্রন্থের যে অংশটি কয়েক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, তার ভূমিকায় (পৃ. L III) উক্ত গ্রন্থের প্রবন্ধ-বিষয়ক অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়বস্তুর নমুনাস্বরূপ কুম্ভবিরচিত গীতগোবিন্দের কয়েকটি প্রবন্ধের নাম দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে "হরিশরণকদলীপত্র" এবং "তালরাগার্ণবমুরারিমঙ্গলকুসুম" এই দুইটি প্রবন্ধের নাম পাওয়া যায়। যদিও এই নাম দুটি রসিকপ্রিয়া টীকায় পাওয়া যায় না, তথাপি অনুমান হয়, এই নাম দুটিই উক্ত প্রবন্ধদ্বয়ে যোজিত হয়েছিল।

১. "যদাশ্রীসংজ্ঞিকোঽপি" এইটি "জয়শ্রীসংজ্ঞিকেঽপি" হলে যথার্থবোধক হয়

২. "মুক্তিপাদা" স্থানে "মুক্তিপাটা" হলে যথার্থবোধক হয়

কুম্ভকর্ণ রসিকপ্রিয়া টীকায় যে সংগীতের পরিচয় প্রদান করেছেন, তা থেকে প্রাচীন প্রবন্ধগায়নরীতি কুম্ভের সময়েও অনেক পরিমাণে প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। সে যুগের শাস্ত্রবর্ণিত প্রবন্ধরূপের একটি প্রত্যক্ষ পরিচয় আমরা কুম্ভকর্ণপ্রবর্তিত গীতরূপ থেকে পাচ্ছি —এই কারণে ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসের দিক্ থেকেও রসিকপ্রিয়া টীকা অত্যন্ত মূল্যবান্। তবে, এখানে একটি কথা বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন যে, যে অষ্টাবিংশ প্রবন্ধের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন, সেগুলি একেবারেই তাঁর নিজস্ব পরিকল্পিত এবং কেবলমাত্র গীতগোবিন্দ গীতিনাট্যেই প্রযোজ্য। কিন্তু তা হলেও সে কালে প্রবন্ধসংগীতে সাধারণভাবে যে রীতিগুলি অনুসৃত হত, যে ষড়ঙ্গের কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, সেগুলির পরিচয়ও কুম্ভবর্ণিত গীত থেকে চমৎকারভাবে পাওয়া যায়। প্রবন্ধ ছাড়া রূপক নামক সংগীতের পরিচয়ও এই গীতগুলি থেকে পাওয়া যায়। বস্তুত পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রচলিত খাঁটি ভারতীয় পদ্ধতিতে রচিত গীতিনাট্যের এটি একটি দুর্লভ উদাহরণ। কুম্ভকর্ণ যে ভাবে গীতগোবিন্দ গীতিনাট্য প্রস্তুত করেছেন, তাতে তাঁর উত্তম সংগীতপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতি প্রবন্ধেই তিনি নূতনত্ব আনতে চেয়েছেন। রাগ, তাল এবং বাদ্যের নানাপ্রকার সমন্বয়ের পরিচয় আমরা তাঁর গীতবিন্যাস থেকে পাই। মধ্যযুগের সংগীতশিল্পের দিক্ থেকে এটি একটি বিশিষ্ট কীর্তি।

## রসিকপ্রিয়া টীকা অনুসারে

## জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ প্রবন্ধে জয়দেব এবং কুম্ভকর্ণ প্রযুক্ত রাগ এবং তালের তালিকা

| প্রবন্ধ | জয়দেব প্রদত্ত রাগ | কুম্ভকর্ণ প্রদত্ত রাগ | জয়দেব প্রদত্ত তাল | কুম্ভকর্ণ প্রদত্ত তাল | কুম্ভকর্ণ প্রদত্ত প্রবন্ধ নাম | সর্গ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১। প্রলয়পয়োধিজলে… | মালব | মধ্যমাদি | রূপক | আদি | দশাবতারকীর্তিধবল | ১ম |
| ২। শ্রিতকমলাকুচ… | গুর্জরী | ললিত | নিঃসার | লঘু-আদি | হরিবিজয়মঙ্গলাচার | ১ম |
| ৩। ললিতলবঙ্গলতা… | বসন্ত | বসন্ত অথবা গুর্জরী | যতি | ঝম্পা | মাধবোৎসবকমলাকর | ১ম |
| ৪। চন্দনচর্চিতনীলকলেবর… | রামকিরি | গুর্জরী | যতি | ঝম্পা | সামোদদামোদরভ্রমরপদ | ১ম |
| ৫। সঞ্চরদধরসুধামধুরধ্বনি… | গুর্জরী | ধন্নাসিকা | যতি | বর্ণযতি | মধুরিপুরভ্রকষ্ঠিকা | ২য় |
| ৬। নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং… | মালব পাঠভেদে মালবগৌড় | ভৈরব | একতালী | বর্ণযতি | অক্লেশকেশবকুঞ্জরতিলক | ২য় |
| ৭। মামিয়ংচলিতা… | গুর্জরী | গৌড়কৃতি | যতি | প্রতিমঠ | মুগ্ধমধুসূদনহংসক্রীড় | ৩য় |
| ৮। নিন্দতিচন্দন… | কর্ণাট | দেশাক বা দেশাখ্য | একতালী | প্রতিমঠ | হরিবল্লভ অশোকপল্লব | ৪র্থ |

| প্রবন্ধ | জয়দেব প্রদত্ত রাগ | কুম্ভকর্ণ প্রদত্ত রাগ | জয়দেব প্রদত্ত তাল | কুম্ভকর্ণ প্রদত্ত তাল | কুম্ভকর্ণ প্রদত্ত প্রবন্ধনাম | সর্গ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ৯। স্তনবিনিহিতমপি… | দেশাখ্য | মালবশ্রী | একতালী | নিঃসারুক | স্নিগ্ধমধুসূদনরাসাবলয় | ৪র্থ |
| ১০। বহতিমলয়… | দেশবরাড়ী | কেদার | রূপক | নিঃসারুক | হরিসমুদয়গরুড়পদ | ৫ম |
| ১১। রতিসুখসারে… | গুর্জরী | কেদার | একতালী | নিঃসারুক | × | ৫ম |
| ১২। পশ্যতিদিশিদিশি… | গোণ্ডকিরী | মালবগৌড় | রূপক | অড্ড | ধন্তবৈকুণ্ঠকুঙ্কুম | ৬ষ্ঠ |
| ১৩। কথিতসময়েঽপি… | মালব | স্থানগৌড় | যতি | বর্ণযতি | স্নিগ্ধমধুসূদনরাসাবলয় | ৭ম |
| ১৪। স্মরসমরোচিত… | বসন্ত | শ্রীরাগ | একতালী | দ্রুতমণ্ঠ | হরিরমিতচম্পকশেখর | ৭ম |
| ১৫। সমুদিতমদনে… | গুর্জরী | মহ্লার | একতালী | দ্রুতমণ্ঠ | হরিরসমন্মথতিলক | ৭ম |
| ১৬। অনিলতরলকুবলয়… | দেশবরাড়ী | বরাটী | রূপক | বর্ণযতি | নারায়ণমদনায়াস | ৭ম |
| ১৭। রজনীজনিতগুরু… | ভৈরবী | মেঘ | যতি | বর্ণযতি | লক্ষ্মীপতিরত্নাবলী | ৮ম |
| ১৮। হরিরভিসরতি… | গুর্জরী পাঠভেদে রামকিরি | নট্ট | যতি | তৃতীয়তাল | অমন্দমুকুন্দ | ৯ম |
| ১৯। বদসি যদি… | দেশবরাড়ী | মধ্যমাদি<br>ললিত<br>গুর্জরী<br>ধানসী<br>ভৈরব<br>গোণ্ডকৃতি<br>দেশাখ্য<br>মালবশ্রী<br>কেদার<br>মালবগৌড়ক<br>স্থানগৌড়<br>শ্রীরাগ<br>মহ্লার<br>বরাটিকা<br>মেঘ<br>ভন্নাবং<br>ধোরণী | অষ্টতালী | বর্ণযতি | চতুরচতুর্ভুজরাগরাজিচন্দ্রোদ্যোত | ১০ম |
| ২০। বিরচিতচাটুবচন… | বসন্ত | নন্দ | যতি | আদি<br>প্রতিমণ্ঠ<br>চতুর্মাত্রিক মণ্ঠ<br>অড্ড<br>বর্ণযতি<br>নবমাত্রিক মণ্ঠ<br>নিঃসারুক<br>ঝম্পা<br>দ্রুতমণ্ঠ<br>রূপক<br>প্রতিতাল<br>ত্রিপুটক<br>একতালী | শ্রীহরিতালরাজিজলধরবিলম্বিত | ১১শ |

| প্রবন্ধ | জয়দেব প্রদত্ত রাগ | কুম্ভকর্ণ প্রদত্ত রাগ | জয়দেব প্রদত্ত তাল | কুম্ভকর্ণ প্রদত্ত তাল | কুম্ভকর্ণ প্রদত্ত প্রবন্ধ নাম | সর্গ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২১। মঞ্জুতরকুঞ্জতল··· | দেশবরাড়ী | বরাড়ী | রূপক<br>পাঠভেদে<br>মণ্ঠ বা<br>আড়ব | — | × | ১১শ |
| ২২। রাধাবদন··· | বরাটী | নট্ট<br>কেদার<br>শ্রী<br>স্থানগৌড়<br>ধোরণী<br>মালব<br>বরাটী<br>মেঘ<br>মালবশ্রী<br>দেবশাখ<br>গৌণ্ডকৃতি<br>ভৈরবী<br>ধন্নাসিকা<br>বসন্ত<br>গুর্জরী<br>মহ্লার<br>ললিত | যতি | দ্রুতমণ্ঠক<br>রূপক<br>প্রতিতাল<br>দ্রুতাল ( দ্বিতীয় তাল )<br>ত্রিপুট<br>দ্রুতপ্রতিমণ্ঠক | সানন্দগোবিন্দরাগশ্রেণী-<br>কুসুমাভরণ | ১১শ |
| ২৩। কিশলয় শয়ন তলে··· | বিভাস | দেবশাখ | একতালী | বর্ণযতি<br>প্রতিতাল | মধুরিপুমোদবিদ্যাধরলীলা | ১২শ |
| ২৪। প্রত্যূহঃপুলাঙ্কুরেণ··· | × | দেবশাখ | × | জয়মঙ্গল | সুরতারম্ভ চন্দ্রহাস | ১২শ |
| ২৫। দোর্ভ্যাংসংযমিত··· | × | গৌড়ী | × | বিজয়ানন্দ | কামিনীহাস | ১২শ |
| ২৬। বামাঙ্কে (মারাঙ্কে) রতিকেলি··· | × | কর্ণাটবঙ্গাল | × | জয়শ্রী | পৌরুষরসপ্রেমবিলাস | ১২শ |
| ২৭। ত্বস্তাপাটলপাণি··· | × | মরুকৃতি | × | যতি | কামাদ্ভুতাভিনবমৃগাঙ্কলেখা | ১২শ |
| ২৮। কুরুযদুনন্দন··· | রামকিরী | গোণ্ড | যতি | আদি<br>পঞ্চ<br>প্রতিমণ্ঠ<br>চতুর্মাত্রিকমণ্ঠ<br>অড্ড<br>বর্ণযতি<br>জয়মঙ্গল<br>বিজয়ানন্দ<br>জয়শ্রী | সুপ্রীতপীতাম্বর | ১২শ |

# আচার্য যদুনাথ সরকার

## ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার

সুপরিণত বয়সে ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকারের তিরোধান ভারতীয় ইতিহাস-চর্চার একটি যুগের অবসান। সমগ্র জীবনের নিরবচ্ছিন্ন সাধনার দ্বারা ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি যে বিরাট কীর্তিসৌধ নির্মাণ করে গেলেন, আমরা তার এতই নিকটবর্তী যে সে কৃতিত্বের যথোচিত মূল্যায়ন বোধ করি ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের সাধ্যাতীত। তাঁর প্রধান আলোচ্যবস্তু ছিল ভারতে মোগল শাসনের শেষ অধ্যায়। গবেষক-জীবনের প্রারম্ভেই তিনি এই বিষয়টি নির্বাচন করেন এবং এই সংক্রান্ত তাঁর ইংরাজী ভাষায় লিখিত মোগল সাম্রাজ্যের পতন শীর্ষক শেষ গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে। উক্ত খণ্ডের ভূমিকায় তিনি বলেছেন :

"The study of the Mughal Empire which I began with my *India of Aurangzeb; Statistics, Topography and Roads* (printed in 1901), has come to an end with the extinction of that empire which is the subject-matter of the present volume. The events of nearly half the reign of Shah Jahan and the whole of Aurangzib's are covered in my *History of Aurangzib* in five volumes with a supplementary work *Shivaji and His Times*. Then follows W. Irvine's *Later Mughals* (1707-1738) in two volumes edited and continued by me, and lastly this *Fall of the Mughal Empire* (1738-1803) in four volumes."

ঐতিহাসিক নিজেই এখানে তাঁর গবেষণার মূল ধারাটি সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত আরও কয়েকখানি গ্রন্থ যদিও প্রকাশিত হয়েছে, তথাপি আওরংজীবের রাজত্বকাল ( এবং প্রসঙ্গতঃ শিবাজীর জীবনী ) এবং ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আওরংজীব—পরবর্তী মোগল সাম্রাজ্যবিষয়ক গ্রন্থগুলিই তাঁর ঐতিহাসিক রচনার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর দ্বারা সম্পাদিত ও পরিবর্ধিত উইলিয়ম আরভিন রচিত *Later Mughals* শীর্ষক দুই খণ্ড গ্রন্থও এই ধারার অন্তর্ভুক্ত। এ ক্ষেত্রে মূল রচনা তাঁর না হ'লেও সম্পাদনার কৃতিত্ব পূর্ণমাত্রায় তাঁর। আরভিনের অসম্পূর্ণ দ্বিতীয় খণ্ডে তিনটি নূতন অধ্যায়ও তাঁকে সংযোজন করতে হয়েছে। সুতরাং বলা যেতে পারে যদুনাথের গবেষণাক্ষেত্রের দেশগত পরিধি সমগ্র ভারতবর্ষ ও কালগত পরিধি আওরংজীবের জন্ম ( ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দ ) থেকে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ ও দৌলতরাও সিন্ধিয়ার মধ্যে সম্পাদিত সর্জি অঞ্জনগাঁওএর সন্ধিচুক্তি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ।

যদুনাথের প্রধান গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তুর কিছু বিস্তারিত পরিচয় এখানে দেওয়া যেতে পারে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত *India of Aurangzib* নামক গ্রন্থে তিনি মুখ্যতঃ মোগল শাসনকালীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বিবরণ, রাজস্বসংক্রান্ত তথ্যাবলী, পথঘাট ইত্যাদি বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁকে প্রধানতঃ তিনখানি মূল ফার্সী আকরগ্রন্থ ব্যবহার করতে হয়েছিল, তা হ'ল যথাক্রমে সুজন রায় রচিত 'খুলাসাতু-ৎ-

তওয়ারিখ্' (রচনাকাল ১৬৯৫ থেকে ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে); রায় চতর মান কায়ৎ রচিত "চাহার্ গুলসান্" (রচনাকাল ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দ); এবং আওরংজীবের সমকালীন সরকারী রাজস্ববিবরণ 'দস্তুর-উল্-আমল্'। কেবল মাত্র আওরংজীবের রাজত্বকালীন বিবরণই যতুনাথ এ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেন নি। আকবরের রাজত্বকাল থেকে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মোগলশাসনসংক্রান্ত বহু প্রাসঙ্গিক তথ্যাদির সমাবেশ এবং আকবর ও আওরংজীবের যুগদ্বয়ের তুলনামূলক আলোচনা গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য। ভূমিকাস্বরূপ প্রথম পাঁচটি অধ্যায়ে লেখক তাঁর সংগৃহীত তথ্যাদির স্বতন্ত্র আলোচনা করেছেন এবং দ্বিতীয় ভাগে 'খুলাসাতু-ৎ তওয়ারিখ্' এবং 'চাহার্ গুলসান্' শীর্ষক ফার্সী গ্রন্থদ্বয়ের অংশবিশেষের ইংরাজী অনুবাদ সংযোজন করেছেন। মোগল-যুগ সম্পর্কে গবেষণাকে যতুনাথ আরও অগ্রসর করে নিয়ে গেলেন তাঁর পরবর্তী সুবিখ্যাত গ্রন্থ *History of Aurangzib*-এ। পাঁচ খণ্ডে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে আওরংজীবের জন্ম থেকে ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত তাঁর জীবনের এবং ভারত-ইতিহাসের ঘটনাবলীর বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। এই তুই খণ্ড মুখ্যতঃ সম্রাট শাহ্জাহানের রাজত্বকালীন ইতিহাস। প্রথম খণ্ডের সমাপ্তিসীমা তাঁর শেষ জীবনের গুরুতর পীড়া ও তাঁর পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত সংঘর্ষের উদ্যোগপর্ব। দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়বস্তু উত্তরাধিকার যুদ্ধ, আওরংজীবের বিজয়লাভ ও সিংহাসনারোহণ। সুতরাং এই তুটি খণ্ডকে সম্রাট আওরংজীবের শাসনকালীন ইতিহাসের ভূমিকাস্বরূপ মনে করা যেতে পারে। আওরংজীবের রাজত্বকাল, পরবর্তী তিন খণ্ডের মুখ্য আলোচ্যবস্তু। গ্রন্থকার এই যুগকে তু'ভাগে ভাগ করেছেন: ১৬৫৮-১৬৮১ (যে সময়ে আওরংজীবের শাসন ছিল প্রধানতঃ উত্তর-ভারত-কেন্দ্রিক); এবং ১৬৮১-১৭০৭ (আওরংজীবের মৃত্যু অবধি রাজত্বের অবশিষ্ট কাল, যখন দক্ষিণভারত-সংক্রান্ত সমস্যাগুলি প্রবল হয়ে দেখা দেওয়ায় তাঁকে দাক্ষিণাত্যেই বসবাস করতে হয়)। শেষ অংশকে ঐতিহাসিক আরও তুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন: ১৬৮১-১৬৮৯ (যে কয়েক বৎসরের মধ্যে অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বিজাপুর, গোলকুণ্ডা এবং সাময়িকভাবে মারাঠা শক্তিকে জয় করে আওরংজীব সমগ্র দক্ষিণ ভারতে নিজের আধিপত্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন); এবং ১৬৮৯-১৭০৭ (আওরংজীবের শেষ আঠারো বৎসরকাল, যখন তাঁর চোখের সামনে ধীরে ধীরে বিরাট মোগল সাম্রাজ্যের ভাঙন স্পষ্ট হতে আরম্ভ করেছিল এবং পরিপূর্ণ ব্যর্থতাবোধ নিয়েই সম্রাটকে পৃথিবী পরিত্যাগ করতে হল)। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডে যথাক্রমে আওরংজীবের রাজত্বকালীন ভারত ইতিহাসের উপরিউক্ত অধ্যায়গুলির বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই বিশাল গ্রন্থ রচনা করবার জন্য লেখককে নির্ভর করতে হয়েছে প্রধানতঃ বিভিন্ন ভাষায় রচিত সমসাময়িক উপাদানের উপর। মোগল যুগের রাজভাষা ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাহিত্যিকভাষা ফার্সীতে রচিত সমসাময়িক সরকারী ও বেসরকারী ইতিবৃত্ত, ফরমান, চিঠিপত্র, দলিল, দস্তাবেজ ইত্যাদি তাঁর রচনার প্রধান উপকরণ।

এর পরিমাণ বিপুল। ভারতবর্ষ ও ইউরোপের বহু স্থান থেকে বহু পরিশ্রমে তাঁকে এ সমূহের সন্ধান ও সংগ্রহ করতে হয়েছে। তা ছাড়া মারাঠী, হিন্দী, প্রাচীন রাজস্থানী, অসমীয়া, ফরাসী, পর্তুগীজ ও ইংরাজী ভাষায় সঞ্চিত উপকরণও তাঁকে নানা স্থানে ব্যবহার করতে হয়েছে। মোগল যুগের ইতিহাস আলোচনা-প্রসঙ্গে যদুনাথের দৃষ্টি স্বভাবতঃ মারাঠা জাতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। সপ্তদশ শতকে মারাঠা রাষ্ট্রীয় অভ্যুত্থান ভারত-ইতিহাসের একটি প্রধান ঘটনা। মোগল-মারাঠা সংঘর্ষের মধ্য থেকেই মারাঠা রাষ্ট্রের উদ্ভব এবং সেই অভ্যুদয়ের বিচিত্র ইতিহাসের নায়ক আওরংজীবের অন্যতম প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী শিবাজী। প্রসঙ্গতঃ তাই যদুনাথকে তাঁর *History of Aurangzib*-এ শিবাজী ও মারাঠা জাতীয় বিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে হয়েছিল। ভোঁসলেদের প্রসঙ্গ প্রথম উত্থাপিত হয়েছে উক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে, শাহজাহানের দাক্ষিণাত্য-নীতি এবং পিতার জীবদ্দশায় আওরংজীবের প্রথম বার দাক্ষিণাত্য শাসনের ( ১৬৩৬—১৬৪৪ ) ইতিহাস বর্ণনাকালে। আওরংজীবের দ্বিতীয় বার দাক্ষিণাত্য প্রদেশ শাসনকালে ( ১৬৫২—১৬৫৭ ) শিবাজীর সঙ্গে মোগল রাষ্ট্রের প্রথম স্বল্পকালস্থায়ী সংঘর্ষ এবং সন্ধি ঘটে। প্রথম খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে এর আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এই বিরোধ দীর্ঘকালব্যাপী মোগল-মারাঠা সংঘর্ষের সূচনা মাত্র। শিবাজীর অভ্যুত্থান, মারাঠা রাষ্ট্রের সংগঠন, শম্ভুজীর শাসনে মারাঠা শক্তির অধোগতি এবং সাময়িক পতন প্রভৃতির বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে উল্লিখিত গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে ( প্রধানতঃ অধ্যায় ৩৯, ৪০, ৪৩, ৪৪ এবং ৪৮ )। কিন্তু মারাঠা রাষ্ট্র সাময়িক ভাবে মোগল-কবলিত হলেও মারাঠাশক্তি নিঃশেষিত হল না। আওরংজীবকে জীবনের শেষ আঠারো বৎসর মারাঠা জাতির সংঙ্গে সংগ্রাম করতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত মারাঠাগণকে বশীভূত করবার আশা মোগল রাষ্ট্রকে পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। মোগল-মারাঠা সম্পর্কের এই অধ্যায়ের আলোচনা ঐতিহাসিক করেছেন *History of Aurangzib*-এর পঞ্চম খণ্ডে ( অধ্যায় ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫ এবং ৫৭ )। এই উপলক্ষ্যে মারাঠা ইতিহাসের যে সকল উপাদান তিনি সংগ্রহ এবং অধ্যয়ন করেছিলেন তার দ্বারা তিনি *Shivaji and His Times* শীর্ষক শিবাজীর একখানি স্বতন্ত্র প্রামাণ্য জীবনী রচনা করেন। এর জন্য তাঁকে সমসাময়িক ফার্সী ইতিবৃত্ত, মারাঠী বখর্, শকাবলী ও কাগজপত্র, ডিঙ্গল ( বা প্রাচীন রাজস্থানী ) ভাষায় লিখিত পত্রাদি, সংস্কৃত ও হিন্দী কাব্যাদি এবং ইংরেজী, ফরাসী ও পর্তুগীজ ভাষায় রক্ষিত সমসাময়িক উপকরণের সাহায্য নিতে হয়েছিল। *History of Aurangzib*-এর চতুর্থ খণ্ডের সঙ্গে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুর অনেকাংশে মিল থাকলেও শিবাজী ও সমসাময়িক মারাঠা ইতিহাস সম্পর্কিত প্রচুর অতিরিক্ত তথ্যের সমাবেশ এতে করা হয়েছে। বইখানিকে যদুনাথের প্রধান আলোচ্য মোগল ইতিহাসের ধারার অন্তর্গত বলেই মনে করা যায়। আওরংজীবের মৃত্যুকাল ( ১৭০৭ ) থেকে নাদিরশাহের উত্তর-ভারত অভিযান ( ১৭৩৯ ) পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্যের ক্রম-অধোগতির ইতিবৃত্তের রচয়িতা যদুনাথ স্বয়ং নন। উইলিয়ম আরভিনের *Later Mughals* শীর্ষক

গ্রন্থের দুটি খণ্ডে এই যুগের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থরচনার সঙ্গে যদুনাথের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। আরভিন্ তাঁর রচনা সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। তাঁর পরিকল্পনা ছিল ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮০৩ পর্যন্ত মোগল ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তিনি রচনা করবেন। কিন্তু ১৭৩৮ পর্যন্ত অগ্রসর হবার পর ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য তিনি তাঁর প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। তাঁর নিজের ভাষায়—

"With the disappearance of the Sayyid brothers the story attains a sort of dramatic completeness and I decide to suspend at this point my contributions on the history of the later Mughals. There is reason to believe that a completion of my original intention is beyond my remaining strength. I planned on too large a scale and it is hardly likely now that I shall be able to do much more....the first draft for the years 1721 to 1738 is written....I have read and translated and made notes for another twenty years ending about 1759 or 1760. The preliminary work for the period 1759-1803 has not been begun."
—*Later Mughals* Vol. II p. 101 footnote.

তাঁর লিখিত অংশের সবটুকুর পুনরালোচনা ও সংশোধন করে যাবার অবকাশও তিনি পান নি। সম্পাদক হিসাবে এ কাজ যদুনাথকেই করতে হয়েছিল। নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে ভূমিকাতে তিনি লিখেছেন—

"His own corrections stop with page 158 of his manuscript of the second part of Muhammad Shah's reign i.e. February 1725 and from this point to the last phase that he wrote (viz. p. 863, dealing with April 1738) the draft is unrevised, incomplete and with many things left doubtful for future verification, correction and completion and rearrangement of the narrative and sifting of evidence. The last portion requires considerable labour on the editor's part. The narrative as sketched by Irvine has to be reconstructed, completed and checked by a close reference to the original, Persian sources. Besides an entirely new class of documents—the Marathi letters and reports—which have seen light since 1898 and which were unknown to Irvine, have to be woven into the text, because of the very important part played by the Marathas in the affairs of the Delhi Empire from 1728 onwards.—*Later Mughals*, Vol. I p. xxviii.

তাছাড়া নাদিরশাহের আক্রমণের বিবরণ (১৭৩৯) এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করে আরভিনের রচনাকে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের রূপ দেওয়ার কৃতিত্বও সম্পূর্ণ সম্পাদকের। দ্বিতীয় খণ্ডের একাদশ (নাদিরশাহের অভ্যুত্থান ও ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের অবস্থা), দ্বাদশ (নাদিরশাহের ভারত আক্রমণ) ও ত্রয়োদশ (নাদিরশাহের সাময়িক ভাবে দিল্লী অধিকার ও প্রত্যাবর্তন) অধ্যায়গুলি সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব রচনা। সুতরাং যদুনাথ স্বয়ং *Later Mughals* গ্রন্থের লেখক না হলেও তাঁর নিজস্ব ঐতিহাসিক গবেষণাধারার মধ্যে এর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। নাদিরশাহের ভারত-ত্যাগের কাল থেকে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে মোগল শাসনের অবলুপ্তি পর্যন্ত চৌষট্টি বৎসরের ইতিহাস যদুনাথের *Fall of the Mughal Empire* শীর্ষক চার খণ্ডে সম্পূর্ণ বিরাট গ্রন্থের বিষয়বস্তু। নাদিরশাহের প্রত্যাবর্তনের পরে মুহম্মদশাহের রাজত্বের অবশিষ্ট ভাগ থেকে (১৭৩৯) দ্বিতীয় আলমগিরের সিংহাসনারোহণ কাল (১৭৫৪) পর্যন্ত ইতিহাস প্রথম খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে; দ্বিতীয় খণ্ডে এই আলোচনা অগ্রসর হয়েছে নজীব-উদ্দৌলার মৃত্যু এবং সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্-আলমের দিল্লী

অধিকার (জানুয়ারী ১৭৭২) পর্যন্ত; তৃতীয় খণ্ডে প্রধানতঃ ১৭৭২ থেকে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-ভারতে মহাদ্‌জী সিন্ধিয়ার নেতৃত্বে মারাঠা প্রতিপত্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা পর্যন্ত দ্বিতীয় শাহ আলমের রাজত্বকালীন ইতিহাস বিবৃত করা হয়েছে; মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে ইংরেজ-মারাঠার সংগ্রাম, পরিশেষে ইংরেজ-শক্তির জয়লাভ এবং নামেমাত্র মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের ইংরেজের আশ্রয় গ্রহণ (১৭৮৮-১৮০৩) শেষ খণ্ডের আলোচ্য বস্তু। সমকালীন ফার্সী ও মারাঠী বিবরণ, দলিলপত্রাদি, হিন্দী ইতিবৃত্তমূলক কাব্য এবং ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় রক্ষিত উপকরণের সাহায্যে এই বিরাট গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

মোগলযুগের শেষ দুই শত বর্ষের ধারাবাহিক ইতিহাস ব্যতীত যদুনাথ আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইংরাজী এবং বাংলা ভাষায় তাঁর অনেকগুলি প্রবন্ধও নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এ সবের বিস্তারিত পরিচয় দেবার স্থান বর্তমান নিবন্ধে নেই এবং সম্ভবতঃ তার প্রয়োজনও নেই। কেননা ঐতিহাসিক যদুনাথের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর উপরিকথিত মোগলযুগের শেষ অধ্যায় বিষয়ক গ্রন্থগুলিতে। তাঁর অন্যান্য রচনা তাঁর প্রধান কীর্তির পরিপূরক এবং মুখ্যতঃ সেই হিসাবেই সেগুলির সার্থকতা। কৌতূহলী পাঠক স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত যদুনাথের রচনাপঞ্জীতে এই সমূহের প্রায় পূর্ণাঙ্গ তালিকা পাবেন। লক্ষ্য করবার বিষয় তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে বৃহৎ পটভূমিকার উপর রচিত ঐতিহাসিক রচনা প্রায় কিছুই নেই। এগুলি প্রচুর গবেষণা ও পরিশ্রমের ফল সন্দেহ নেই, কিন্তু এক্ষেত্রে গবেষণার প্রকৃতি ভিন্ন। তাঁর অপ্রধান গ্রন্থ-প্রবন্ধাদির মধ্যে দুটি শ্রেণী দেখতে পাওয়া যায়। কতগুলি মোগল-কালীন ভারত ইতিহাসের কোনও একটি বিশেষ দিকের উপর আলোকপাত করেছে (যেমন মোগলশাসন সংক্রান্ত ইংরাজী গ্রন্থ *Mughal Administration*; অথবা মোগল ও মারাঠা ইতিহাস সম্পর্কিত প্রবন্ধ-সমষ্টি *Studies in Mughal India*, *Studies in Aurangzib's Reign* এবং *House of Shivaji*, প্রভৃতি; অন্যগুলি সম্পূর্ণ ভিন্নগোত্রের, প্রধানতঃ মূল ঐতিহাসিক উপাদানের প্রামাণ্য সংস্করণ বা অনুবাদ (যেমন চৈতন্য-চরিতামৃতের ইংরাজী অনুবাদ *Chaitanya's Life and Teachings*; আওরংজীবের সমসাময়িক হামিদ্‌উদ্দিন খাঁ লিখিত ফার্সী গ্রন্থ আহ্‌খম্‌-ই আলমগিরির প্রামাণ্য সংস্করণ এবং তার ইংরাজী অনুবাদ *Anecdotes of Aurangzib*; মুস্তাদ খাঁ সংকলিত আওরংজীবের রাজত্বকালীন সমসাময়িক আকর গ্রন্থ মাসির-ই-আলমগিরির ইংরাজী অনুবাদ; পেশোয়া, সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা দরবারের ইংরাজ রেসিডেন্টগণ কর্তৃক প্রেরিত বিবরণের *Poona Residency Correspondence* শীর্ষক সংস্করণের প্রথম অষ্টম ও চতুর্দশ খণ্ডের সম্পাদনা, ইত্যাদি)। তাঁর প্রথম গ্রন্থ *India of Aurangzib*কেও এই শ্রেণীতে ফেলা যায় যদিও তিনি স্বয়ং তাঁর মূল ইতিহাস-সাধনার ধারার মধ্যে তার স্থান নির্দেশ করেছেন। এই দুই শ্রেণীর রচনার সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গেলে বলতে হয়,

প্রথমগুলি তাঁর মূল গবেষণা-সংশ্লিষ্ট কয়েকটি দিকের বা সমস্যারই বিশেষ আলোচনা ; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থসমূহ ইতিহাস অপেক্ষা অধিকতররূপে পুরাতত্ত্বের লক্ষণ-মণ্ডিত।

ইতিহাস এবং পুরাতত্ত্বের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হলেও মানবজ্ঞানের এই বিভাগদ্বয় অভিন্ন নয়। ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ, তার নির্বাচন, বিশ্লেষণ, কালনির্ণয়, সম্পাদন, তালিকাকরণ প্রভৃতি পুরাতত্ত্ববিদের প্রধান উপজীব্য। কিন্তু ঐতিহাসিকের নিকট এই সকল প্রচেষ্টা নিজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। পুরাতত্ত্ববিদের কাজ যেখানে শেষ, বলা যেতে পারে, তাঁর কর্তব্যের সেখানে আরম্ভ। স্ব-নির্বাচিত দেশকালের অন্তর্গত জাগতিক ঘটনাপুঞ্জকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতগুলি বিচ্ছিন্ন তথ্যের সমষ্টি হিসাবে বিচার না করে, সেগুলির বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে একটি পারস্পরিক যোগসূত্র ও একটি কার্যকারণশৃঙ্খলা আবিষ্কারের চেষ্টাই ঐতিহাসিকের প্রধান লক্ষ্য। কোন্ দৃষ্টিভঙ্গী বা যুক্তিক্রম এই উদ্দেশ্যসাধনের সর্বোত্তম উপায়, সে প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর থাকতে পারে কিন্তু মূল লক্ষ্যের প্রকৃতি সম্পর্কে মতভেদের অবকাশ অল্প। সুতরাং জ্ঞানচর্চার এই দুই ক্ষেত্রেই পরিশ্রম ও মননশীলতার প্রয়োজন অত্যধিক হলেও ঐতিহাসিকের পক্ষে উন্নততর বিচারবুদ্ধি এবং গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি যে নিতান্ত অপরিহার্য এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তথাপি, ইতিহাস বস্তুনির্ভর বলেই, তার পক্ষে পুরাতত্ত্বের সাহায্য ব্যতীত অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। বস্তুপরিচয়ে এতটুকু ছিদ্র থাকলে যে কোনও ঐতিহাসিকের কীর্তির বনিয়াদ শিথিল হয়ে পড়তে বাধ্য। তাই দেখা যায় তাঁদের ইতিহাস-সাধনা আরম্ভ করবার পূর্বে বা সঙ্গে সঙ্গে অনেক ঐতিহাসিককেই স্ব স্ব ক্ষেত্রের পুরাতত্ত্ব উদ্ধার ও আলোচনার কাজে রত হতে হয়েছে, সে কাজে তাঁদের স্বাভাবিক প্রবণতা থাকুক আর নাই থাকুক। পাশ্চাত্য জগতের তুলনায় ভারতে এ প্রয়োজন আরও অধিক এই জন্য যে স্বতন্ত্রভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পুরাতত্ত্ব উদ্ধার ও আলোচনার কাজে আমাদের দেশ অপেক্ষাকৃত কম অগ্রসর। যদুনাথ ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নন। তাঁর আজীবন ইতিহাস-সাধনার পাশাপাশি পুরাতত্ত্বালোচনার সমান্তরাল ধারাটিও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার মত। এই কাজের দুরূহতা সম্পর্কে তাঁর প্রথম গ্রন্থ *The India of Aurangzib* এর ভূমিকায় তিনি যা বলেছেন তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

"The path of the Indian antiquarian is, moreover beset with peculiar difficulties. It is seldom that the requisite materials are all accessible to him. He has to settle the texts of his authorities, few of which have been printed and fewer still edited. He is expected to correct and identify wrongly spelt proper names though he has often no second manuscript to collate with the one lying before him. Then again he can expect very little help from brother-antiquarians because the field is large and the labourers few. Pandits and Maulavis are of little assistance except in throwing light on the grammar or explaining the probable meaning of the text. They are ignorant of historical criticism ; the usual materials on which the antiquarian works being obscure books and not classics, they are never studied as text-books or even read for pleasure by our Pandits and Maulavis. The historical student in India is thrown almost on his own resources....To expect perfection

in such a branch of study is hardly more reasonable than to ask a goldsmith to give a proof of his professional skill by prospecting for gold, digging the mine extracting and refining the ore and then making the ornament."—p. ix.

গবেষক জীবনের আরম্ভে এই বিপুল বাধার সম্মুখীন তাঁকে স্বয়ং হতে হয়েছিল বলেই তিনি ইতিহাসের সহিত আজীবন অবিশ্রাম পুরাবৃত্তের চর্চাও করে গিয়েছেন। পুরাতাত্ত্বিক রূপে তাঁর কীর্তির পরিমাণ নিঃসন্দেহে বিপুল। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা বলা চলে, যদুনাথের স্বাভাবিক প্রবণতা পুরাতত্ত্বের প্রতি নয়, ইতিহাসের প্রতি। তাঁর প্রতিভার সার্থকতম পরিচয় বহন করছে তাঁর ঐতিহাসিক রচনাবলী। ইতিহাস সাধনার কীর্তিসৌধ নির্মাণে সহায়ক রূপেই তাঁর নিকট পুরাবৃত্তের মূল্য। পুরাতাত্ত্বিক হিসাবে তাঁর সমকক্ষ বা তাঁর অপেক্ষা বৃহত্তর পণ্ডিত হয়তো তাঁর সমকালে বিরল নন। কিন্তু নিজক্ষেত্রে ঐতিহাসিক হিসাবে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

যদুনাথের প্রধান ইতিহাস গ্রন্থগুলিকে পর্যায়ক্রমে সজ্জিত করলে আমরা যা পাই তা হল সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামরিক ইতিহাস। আওরংজীব থেকে দ্বিতীয় শাহ্ আলম পর্যন্ত মোগল রাষ্ট্র বিবর্তনকে কেন্দ্র করেই তাঁর মূল রচনার কাঠামোটি গড়ে উঠেছে। প্রসঙ্গতঃ সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে উনবিংশ শতকের আরম্ভকাল পর্যন্ত মারাঠা শক্তির উত্থান পতনের ইতিহাসও এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। দিল্লী রাজনীতির আলোচনা প্রসঙ্গে যেটুকু প্রয়োজন হয়েছে, আঞ্চলিক ইতিহাস আলোচনার সীমা লেখক কোনও খানে তার অধিক সম্প্রসারিত করেন নি। আওরংজীবের সমকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় এই প্রণালীর প্রয়োগ তাঁর পক্ষে নিতান্ত কষ্টসাধ্য হয়নি, কেননা তখন পর্যন্ত মোগল শাসনতান্ত্রিক ঐক্য সারা দেশে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আওরংজীবের পরবর্তীকালে, বিশেষতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রবন্ধন প্রায় অবলুপ্ত হওয়াতে ভারতবর্ষ কতগুলি বিবদমান স্বতন্ত্র আঞ্চলিক শক্তির সমষ্টিতে পরিণত হয়। এই রাষ্ট্রীয় ঐক্যবিহীন যুগের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়নেও যে উপরিউক্ত পরিকল্পনা ও রচনাপদ্ধতি কত সার্থকভাবে অনুসরণ করা যেতে পারে *Fall of the Mughal Empire* গ্রন্থে যদুনাথ তা দেখিয়েছেন। আলোচনার মূল সূত্রটিকে অবিচ্ছিন্ন রাখবার জন্য তিনি যে উপায় অবলম্বন করেছিলেন, সে সম্পর্কে তাঁর নিজের উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

"Such a long survey always on the basis of original sources in many languages, could be completed only by the rigid exclusion of those provinces of India which had broken away from the Mughal Empire and also by ignoring events not directly related to the fate of that empire such as the Anglo French rivalry for the domination of India and the dynastic struggles in the provinces that had renounced the suzerainty of Delhi."

মুখ্যতঃ দিল্লী সাম্রাজ্যের ইতিহাস লিখতে বসে নিজ রচনা-পরিধিকে এই ভাবে সীমাবদ্ধ না করে ঐতিহাসিকের গত্যন্তর ছিলনা। অন্যথা প্রতিপদে দিশাহারা হয়ে প্রাদেশিক ইতিহাসের খুঁটিনাটির মধ্যে মগ্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। পরিকল্পনার এই সামঞ্জস্যবোধ

ও সংযম ঐতিহাসিক হিসাবে যতুনাথের বিশেষত্ব। অষ্টাদশ শতকীয় ভারতবর্ষের নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার মধ্যেও যে রাষ্ট্রীয় সংহতির একটি মূল সূত্র আছে এবং তা অবলম্বন করে যে সমগ্র দেশের প্রামাণ্য রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস রচনা করা সম্ভব যতুনাথই প্রথম তা দেখালেন। অথচ সমগ্রভাবে তাঁর রচনা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের উপর যে পরিমাণ আলোকপাত করেছে তা বিস্ময়কর। আওরংজীবের রাজত্বকালীন উত্তর ভারতে রাজপুতানা, পঞ্জাব গুজরাত কাশ্মীর বাঙলা আসাম, মধ্যভারতের মালোয়া বুন্দেলখণ্ড গণ্ডোয়ানা, দক্ষিণভারতের বিজাপুর গোলকোণ্ডা এবং মারাঠা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাস তাঁর দানে সমৃদ্ধ। অষ্টাদশ শতকের মোগল রাষ্ট্রীয় ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গেও বাঙলা বিহার উড়িষ্যা অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, ভরতপুর রাজপুতানা পঞ্জাব মালোয়া বিভিন্ন মারাঠা রাষ্ট্র প্রভৃতির আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে তিনি যে প্রাসঙ্গিক তথ্য পরিবেশন করেছেন তা পরবর্তী গবেষকগণের কাজের বিশেষ সহায়ক হয়েছে। যতুনাথ সংগৃহীত তথ্যের প্রাথমিক সহায়তা এবং তাঁর গ্রন্থ থেকে অনুপ্রেরণা না পেলে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকীয় প্রাদেশিক ইতিহাস সংক্রান্ত গবেষণার গতিবেগ অপেক্ষাকৃত মন্থর হয়ে পড়তো, একথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের মধ্যে সামরিক ইতিহাসের রচয়িতা হিসাবেও যতুনাথ অদ্বিতীয়। তাঁর পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকগণও যুদ্ধ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তা পড়লে মনে হয় সেটুকু যেন তাঁদের রচনায় অবান্তর তথ্য, সে বিবরণ বাদ দিয়ে কেবলমাত্র যুদ্ধের তারিখ ও ফলাফল উল্লেখ করে দিলেও মূল রচনার অঙ্গহানি ঘটতো না। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তির অভ্যুত্থান বিবর্তন ও অবক্ষয়ের সঙ্গে যুদ্ধের যে গূঢ় অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে সে তত্ত্ব এদেশে যতুনাথের রচনাতে প্রথম সুস্পষ্ট-ভাবে পাওয়া গেল। সামরিক ইতিহাসে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যই এর একমাত্র কারণ নয়। ঐতিহাসিক ঘটনা-স্রোতের চলমান প্রবাহের মধ্যে অগ্রপশ্চাৎ সামঞ্জস্য বিধান করে তিনি যুদ্ধ বিবরণ এমন সুকৌশলে বিন্যস্ত করেছেন, যে তা তাঁর সমগ্র রচনাকে বিন্দুমাত্র ভারাক্রান্ত না করে, রাষ্ট্রীয় ইতিহাসকে নূতন ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করে তুলেছে। উদাহরণস্বরূপ তাঁর রচনা থেকে সুবিখ্যাত তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধের বিবরণটিকে বেছে নেওয়া যেতে পারে *Fall of the Mughal Empire vol. ii p. 298-372*। ভারতবর্ষের আধুনিক ঐতিহাসিক সাহিত্যে এর তুলনা নেই। অন্যত্র অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিসর বর্ণনাতেও এ বিষয়ে তাঁর স্বকীয়তার ছাপ সুস্পষ্ট, যথা ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ধর্মাত ও সামুগড়ের যুদ্ধ—*History of Aurangzib, vol. ii p. 348-71 ; 381-405* ; ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের খাজোয়ার যুদ্ধ এবং দেওরাইএর যুদ্ধ—*Ibid pp. 475-96 ; 907-17*) ; ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজ্‌দ্দৌলা কর্তৃক কলিকাতা অধিকারকল্পে ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ—*History of Bengal, Dacca University, vol. ii pp. 473-76;* ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সুবিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধ—*Ibid pp. 487-97,* ইত্যাদি। ভারতবর্ষের একটি স্বতন্ত্র ধারাবাহিক সামরিক ইতিহাস রচনার পরিকল্পনা যতুনাথের ছিল এবং ***Military History of India*** **শীর্ষক এর কয়েকটি অধ্যায়** ***Hindusthan Standard***

পত্রিকায় প্রকাশিত ও হয়েছিল। এই গ্রন্থ তিনি সমাপ্ত করে যেতে পারলে যুদ্ধবিদ্যার ইতিহাস নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ হত।

রচনার সর্বতোমুখী মূলানুগতা ঐতিহাসিক হিসাবে যদুনাথের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। ঐতিহাসিকের প্রথম কর্তব্য ইতিহাসের মূল উপাদানগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারবিশ্লেষণপূর্বক তথ্য নিষ্কাশন। এই কাজে তাঁকে সাধারণতঃ দুটি বড় বাধা অতিক্রম করতে হয়, তার একটি বাহ্য, অপরটি আভ্যন্তরীণ। প্রথমতঃ নানা ভাষার আধারে সঞ্চিত উপকরণগুলিকে আয়ত্ত করতে হলে গভীর ও ব্যাপক ভাষাজ্ঞানের প্রয়োজন। ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে এ কথা তো বিশেষভাবেই প্রযোজ্য, কেননা ভারত সর্বযুগেই বহুভাষার দেশ। দ্বিতীয়তঃ মূল উপাদান হতে আহৃত তথ্যপুঞ্জ পূর্ণমাত্রায় আমাদের মনোগত সংস্কার বিশ্বাসাদির অনুকূল না হ'তেও পারে; সে ক্ষেত্রে সেগুলিকে বর্জন করে তথ্যের সাক্ষ্য অনুযায়ী সত্যপথে চলবার জন্য যে মনোবলের প্রয়োজন, অল্পসংখ্যক লোকেরই তা আছে। যদুনাথ এই দুটি বাধাই সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর ভাষাজ্ঞান ছিল সুবিস্তীর্ণ এবং মন ছিল সংস্কারবর্জিত নির্মম সত্য-সন্ধানী। নিজের গবেষণার জন্য, ফার্সী, মারাঠী, প্রাচীন রাজস্থানী, অসমীয়া, কিঞ্চিৎ সংস্কৃত, ইংরাজী, ফরাসী ও পর্তুগীজ ভাষায় রক্ষিত মূল উপাদান পাঠ করে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন, অনুবাদ বা অনুবাদের অনুবাদ নিয়ে কারবার করেন নি। এতগুলি ভাষা আয়ত্ত করবার জন্য তাঁকে কি কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। বস্তুতঃ এ যুগে ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের মধ্যে এমন অক্লান্ত সাধনায় নিজেকে গবেষণাকার্যের জন্য প্রস্তুত করবার দৃষ্টান্ত বোধ করি দ্বিতীয় নেই। তেমনি পরিশ্রমলব্ধ তথ্য ব্যবহার করবার সময়ে তিনি যে কঠোর আপসহীন সত্যানুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়েছেন তাও অতুলনীয়। ভাবাবেগ, পূর্বসংস্কার প্রভৃতি কিছুই তাঁর নিরপেক্ষতার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। এ বিষয়ে নিজমত তিনি একটি বাঙ্‌লা প্রবন্ধে এইভাবে ব্যক্ত করেছিলেন: "এ দেশে সবচেয়ে বেশী আবশ্যক মনের উন্মুক্ততা, অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের সমস্ত সংস্কারগুলি বর্জন করিয়া একেবারে সাদাসিদা মন লইয়া অতীতের ঘটনাগুলির সত্যস্বরূপ বাহির করিবার প্রবৃত্তি এবং তাহার জন্য সমাজের সমস্ত দণ্ড ভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া"।[১] তাঁর এই নির্ভীক সত্যানুসন্ধান এদেশে অনেকের সংস্কারে আঘাত করেছে এবং ফলে অনেক সময়ে তাঁকে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। মুসলমান পণ্ডিতমহল থেকে ইসলাম—বিরোধিতা ও মহারাষ্ট্রীয় ঐতিহাসিকমণ্ডলী থেকে মোগল-পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ যুগপৎ তাঁর বিরুদ্ধে উঠেছে, তিনি বিচলিত হন নি। জাতীয় আন্দোলন-জনিত ভাবাবেগের জোয়ারে যখন অযোগ্য ঐতিহাসিক চরিত্রসমূহকে মহাপুরুষের প্রাপ্য সম্মান দেওয়ার ঢেউ উঠেছিল, যদুনাথ তার কঠোর প্রতিবাদ করেন। প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার সমালোচনা করতে

---

১. "ইতিহাস এক মহাদেশ"—ইতিহাস, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা পৃ. ৩

তাঁর দ্বিধাবোধ দেখা যায় নি। সিরাজ-উদ্দৌলাকে দেশপ্রেমিক নায়ক ঘোষণা করবার জন্য সুভাষচন্দ্রের উপর তিনি প্রসন্ন ছিলেন না। কল্‌হণের মতে আদর্শ ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত হবে অকারণ বিদ্বেষ ও অহেতুক অনুরাগ বিবর্জিত। এই আদর্শের পূর্ণ রূপায়ন মানুষে সম্ভব কিনা সন্দেহ, কিন্তু মানুষ নিজ সাধনায় এর কতটা নিকটবর্তী হতে পারে যদুনাথ তার উদাহরণ।

যদুনাথের ঐতিহাসিক গবেষণার আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য তাঁর ভৌগোলিক তথ্য-নিষ্ঠা। কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যায় একটি দেশের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যে অসম্ভব তা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। তাই বস্তুপরিচয় সম্পূর্ণ করবার জন্য তিনি বর্ণিত ঘটনাস্থলসমূহ পরিদর্শন করবার সুযোগ কখনও ত্যাগ করেন নি। সমগ্র দেশের ভূসংস্থান সম্পর্কে এত গভীর জ্ঞান এ যুগে অন্য কোনও ভারতীয় ঐতিহাসিকের মধ্যে প্রায় দেখা যায় না।[১] ভৌগোলিক তথ্যের সামান্যতম খুঁটিনাটিও তাঁর অবহেলার বস্তু ছিল না এবং আকরগ্রন্থে উল্লিখিত ক্ষুদ্রতম গ্রামটিরও অবস্থান নির্ণয়ে তাঁর একান্ত আগ্রহ ও অধ্যবসায় দেখা যেত। এই সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠ দেশ-পরিচয়ের ফলেই তাঁর রচিত ইতিহাস এত বাস্তব ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ভৌগোলিক জ্ঞানের সর্বাধিক নিপুণ ব্যবহার তিনি করেছেন তাঁর যুদ্ধবর্ণনায়, যার ফলে উভয় পক্ষের সৈন্যসংস্থান ও সৈন্য চালনার প্রতিটি ধাপ যেন পাঠকের নিকট প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। জনৈক ফরাসী মনীষী বলেছিলেন, গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে (প্রত্যক্ষ না দেখে) দূর থেকে কাজ করতে গেলে কখনও কখনও গ্রন্থাগারকে দেশ বলে ভুল করবার আশঙ্কা থাকে (A travailler loin de l'objet de ses e'tudes on risque de prendre quelquefois une bibliotheque pour l'equivalent d'un pays)। যদুনাথ সে ভুল করেন নি।

যদুনাথের ঐতিহাসিক রচনার বিশিষ্ট সম্পদ তার অসামান্য প্রসাদগুণের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ না করলে বর্তমান নিবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সারবত্তা ও প্রাণবত্তার এমন মণিকাঞ্চন সংযোগ এ যুগে অন্য কোনও ভারতীয় ঐতিহাসিকের লিখনশৈলীতে দেখা যায় না। বাঙ্‌লা ভাষার দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর প্রধান গ্রন্থসমূহ ইংরাজীতে রচিত (যদিও তাঁর সমগ্র বাঙ্‌লার রচনার পরিমাণ নিতান্ত কম নয়!) সুতরাং রচনারীতি বলতে আমাদের প্রধানতঃ তাঁর ইংরাজী রচনারীতিরই বিচার করতে হবে। তিনি ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন, পরবর্তীকালে সে বিষয়ে অধ্যাপনাও করেছেন। এই অধ্যয়ন, অধ্যাপনা বৃথা যায় নি, প্রকাশভঙ্গীর চমৎকারিত্বহেতু তাঁর রচিত ইতিহাস, স্বরূপ অবিকৃত রেখেও সাহিত্য হয়ে উঠেছে। এ কথা আমাদের দেশের অতি অল্পসংখ্যক ঐতিহাসিকের রচনা সম্পর্কেই বলা যায়। তথ্যের ভারে এঁদের অনেকেরই রচনা নীরস এবং মন্থরগতি। কিন্তু এ বিষয়ে যদুনাথ ছিলেন সজাগ শিল্পী।

১. এ বিষয়ে যদুনাথের সঙ্গে কিয়ৎ পরিমাণে তুলনীয় অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী। তাঁর 'প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস চর্চায় ভৌগোলিক তথ্য যথেষ্ট সম্মান পেয়েছে।

তথ্যসমৃদ্ধ যুক্তিনিষ্ঠ ইতিহাসকে প্রকাশভঙ্গীর ঐশ্বর্যে সাহিত্যিক মহিমমণ্ডিত করে তুলবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি কর্তব্য শেষ হয়েছে বলে মনে করতেন না। জার্মান-পণ্ডিতগণের নীরস গুরুগম্ভীর রচনাপ্রণালী তাঁর মনঃপুত ছিল না।

ঐতিহাসিক হিসাবে যতুনাথের কীর্তির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ মাঝে মাঝে হয়ে থাকে যে তিনি আজীবন কেবলমাত্র রাজবৃত্তান্ত ও রণবৃত্তান্ত আশ্রয় করে ইতিহাস সাধনা করে গিয়েছেন, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস আলোচনা করেন নি। আপাতদৃষ্টিতে এই অভিযোগ সত্য বলে মনে হলেও এ বিষয়ে কয়েকটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। প্রথমতঃ অভিযোগটি ঋণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীপ্রসূত। কোনও মনীষীর আজীবন সাধনার ফলে আমরা কি পেয়েছি সেইটুকুই বড় কথা, কি পাই নি তার হিসাব মিলানো বোধ হয় সব সময়েই খানিকটা নিরর্থক। যতুনাথ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামরিক ইতিহাস এত সবিস্তারে এবং নিখুঁত ভাবে আলোচনা করেছেন যে, পরবর্তী গবেষকগণের সেক্ষেত্রে আর বিশেষ কিছু করবার নেই। তা ভিন্ন তিনি পুরাতাত্ত্বিক হিসাবে গত অর্ধশতাব্দী যাবৎ ভারতীয় মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ, অনুবাদ, আলোচনা ইত্যাদি কাজের দ্বারা ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের প্রাথমিক অসুবিধা দূর করে গবেষণার পথ যে ভাবে সুগম করে দিয়েছেন, তা আর কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। এক জীবনের পক্ষে এ যে কি বিরাট দান তা ধারণা করাও সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি নিজে তাঁর কীর্তির অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং এ বিষয়ে তাঁর *Fall of the Mughal Empire* গ্রন্থের শেষ খণ্ডের ভূমিকায় স্পষ্ট বলেছেন—

"A more serious defect is that social and economic history of this long stretch of time has been crowded out of this present series..."

সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, অর্থনৈতিক তথ্য এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগীয় তথ্য সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার যে পদ্ধতি আধুনিক জগতে ক্রমশঃ সমাদৃত হচ্ছে, সে সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ও শ্রদ্ধা ছিল। বাংলা ভাষায় এই শ্রেণীর একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা শ্রীনীহাররঞ্জন রায়-প্রণীত 'বাঙালীর ইতিহাস' শীর্ষক গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি গ্রন্থকারের অভিনব উদ্যমকে যে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছেন, তা তাঁর উদার মনের প্রগতিশীলতারই পরিচায়ক। স্বীয় সাধনার দ্বারা তিনি এই দুই শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাসের পূর্ণ রূপ উদ্‌ঘাটিত করে এই জাতীয় অন্যান্য গবেষণার ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করে গিয়েছেন এই আমাদের পরম সৌভাগ্য।

যতুনাথকে অনেক সময়ে ইংরেজ ঐতিহাসিক গিবনের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। এই তুলনা স্বভাবতঃ মনে আসে এই জন্য যে, গিবন ও যতুনাথ দুজনেই বিভিন্ন কালের দুটি বিরাট সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস রচনা করেছেন। কিন্তু একটু চিন্তা করলে বোঝা যাবে নিজ নিজ বিষয়বস্তু সম্পর্কে এই দুই মহা ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে মৌলিক পার্থক্য ছিল। গিবন ছিলেন প্রাচীন গ্রীক-রোমান সংস্কৃতির একান্ত ভক্ত এবং রোমক সাম্রাজ্য তাঁর

নিকটে ছিল মানব-সভ্যতার এক মহান কীর্তি (solid fabric of human greatness)। কি ভাবে নানা প্রতিকূল ও বর্বর শক্তির আঘাতে এবং খ্রীষ্টধর্মের ক্রমবিস্তারমান প্রভাবের ফলে, এই গৌরবময় সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে গেল তাই ছিল তাঁর আলোচ্য বিষয়। নিজের রচিত ইতিহাস সম্পর্কে তাই তিনি বলতে পেরেছেন, "I have described the triumph of barbarism and religion." কিন্তু মোগল সাম্রাজ্য ও মোগল যুগ সম্পর্কে যদুনাথের এই সশ্রদ্ধ মনোভাব ছিল না। কর্ণাটকের রাজা শ্রীরঙ্গ রায়ালের সঙ্গে শাহজাহান ও আওরংজীবের শঠতাপূর্ণ আচরণের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টই বলেছেন,—

"To the historian whose eyes are not dazzled by the Peacock Throne, the Taj Mahal and other examples of outward glitter, this episode (with many others of the same kind) proves that the Mughal empire was only a thinly veiled system of brigandage. It explains why the Indian princes, no less than the Indian people so readily accepted England's suzerainty.[১]

মধ্যযুগে ভারতে স্থাপিত ইসলামীয় রাষ্ট্র এদেশকে উত্তরোত্তর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধঃপতনের পথে পরিচালিত করেছে, এই ছিল তাঁর সুচিন্তিত অভিমত।[২] আওরংজীবের চরিত্রে নানা প্রশংসনীয় গুণ থাকা সত্ত্বেও প্রতিক্রিয়াশীল সংকীর্ণ ও ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার প্রতীক রূপে ইতিহাসে তাঁর আবির্ভাব। কালের স্রোতকে রুদ্ধ করবার জন্য তাঁর অক্লান্ত প্রয়াসের মধ্যে হয়তো বা ট্র্যাজেডির মহনীয়তা আছে, কিন্তু শোচনীয় ব্যর্থতা তার অনিবার্য পরিণতি। তার পর? মধ্যযুগের তমিস্রার অবসানে নূতন যুগের প্রভাতকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন ঐতিহাসিক তাঁর ইতিহাসের সর্বশেষ খণ্ডে। ভারতে ব্রিটীশ-শক্তির অভ্যুদয়ে আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারালাম বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সোনার কাঠির স্পর্শে মনের মুক্তি ঘটল সেটাই বড় কথা। ব্রিটীশ-শাসিত ভারতে উনবিংশ শতকে আমাদের ইতিহাসের আধুনিক পর্বের শুরু Fall of the Mughal Empire. Vol. IV pp. 346-50। সুতরাং সহজেই বোঝা যায় প্রাচীন রোমানগণের কীর্তি সম্পর্কে গিবনের যেমন সশ্রদ্ধ উচ্ছ্বাস ছিল,[৩] মোগলযুগ সম্পর্কে সেই জাতীয় শ্রদ্ধাবোধের অধিকারী যদুনাথ ছিলেন না। মধ্যযুগের রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যদুনাথের উপরিউক্ত মূল সিদ্ধান্ত যুক্তিগ্রাহ্য কি না সে আলোচনার বর্তমানে কোনও প্রয়োজন নেই। ভারতবর্ষে ইসলামীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির ফলে লাভ বা ক্ষতি কোনটির পরিমাণ বেশী হয়েছে, সে সম্পর্কে ভিন্ন মত এবং আলোচনা প্রণালীর অস্তিত্ব আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এই প্রসঙ্গে আমাদের শুধু মনে রাখা প্রয়োজন যে কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর বাহ্য সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে গিবন এবং যদুনাথের উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনা করলে উভয়ের কীর্তিকেই ভুল বোঝবার সম্ভাবনা থাকে।

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

১. History of Aurangzib ii, p. 226.
২. History of Aurangzib iii, pp. 248-79 ; v pp. 436-96.
৩. 'My temper is not very susceptible of enthusiasm and the enthusiasm which I do not feel, I have ever scorned to affect. But.. I can never forget nor express the strong emotions which agitated my mind as I approached and entered the *eternal city*.'—Gibbon *Miscellaneous Works*—vol. 1, pp. 194-96.

## আচার্য্য যদুনাথের বাংলা রচনাবলী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক আচার্য্য যদুনাথের 'অষ্টসপ্ততিতম বর্ষ পরিপূর্ত্তি উপলক্ষে সম্বর্দ্ধনা'-কালে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকার—সংক্ষিপ্ত জীবনী, রচনাপঞ্জী ও মানপত্র" নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন, ( ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯ )। এই পুস্তিকায় প্রকাশিত বাংলা রচনাপঞ্জী পূর্ণতর করিয়া শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত Sir Jadunath Sarkar Commemoration Volume এর প্রথম ভাগে ( ১৯৫৭ ) প্রকাশ করেন, ইহাতে ১৩৬০ পর্য্যন্ত প্রকাশিত রচনাদির তালিকা যোগ হইয়াছে। 'ইতিহাস' পত্রের অষ্টম খণ্ডের চতুর্থ সংখ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত রচনাপঞ্জী পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে, 'ইতিহাস'-পত্রে প্রকাশিত রচনাবলীর সূচী তাহাতে যুক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান সূচী এই তিনটির সূচীর সমাহার; অপিচ, শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত ইতিপুর্ব্বে অনুল্লিখিত কয়েকটি রচনা এই সূচীভুক্ত করিয়াছেন।— পত্রিকাধ্যক্ষ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

### রচিত গ্রন্থ ও পুস্তিকা

১. পাটনার কথা। ১৩২৩, বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মেলনের বাঁকিপুর অধিবেশনে পঠিত বক্তৃতা। পৃ. ১৬।

২. ২৫ বার্ষিক বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা ও সম্মেলন। ১৩৩৪, পৃ. ৮।

৩. শিবাজী। ( নভেম্বর ১৯২৯ )। পৃ. ২৬৪।

৪. মারাঠা জাতীয় বিকাশ ( সরল কাহিনী )। আষাঢ় ১৩৪৩ ( ইং ১৯৩৬ )। পৃ. ৪৮।
সূচী : মারাঠা জাতির অভ্যুদয়, শিবাজী, শিবাজীর পর মারাঠা ইতিহাসের ধারা, মহারাষ্ট্র সাহিত্য ও ইতিহাস উদ্ধারের কাহিনী।

৫. আচার্য্যের অভিভাষণ। ১৩৫৭, পৃ. ৮।

### সম্পাদিত গ্রন্থ

সিয়ার-উল্-মুতাখ্খরীন্ : অনুবাদক গৌরসুন্দর মিত্র। কার্ত্তিক ১৩২২ ( ইং ১৯১৫ )। পৃ. ৪০ ( অসম্পূর্ণ )।

### সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রচনা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৩০২ | বৈশাখ | 'সুহৃদ্' | হরিদ্বার ও কুম্ভমেলা ৮১ বৎসর পূর্ব্বে' |
| ১৩১১ | কার্ত্তিক | 'প্রবাসী' | আওরাঙ্জিবের আদি লীলা |
| ১৩১২ | আষাঢ় | 'নবনূর' | সাধু-বচন |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৩১২ | অগ্রহায়ণ | 'প্রবাসী' | কবি-বচন-সুধা |
| | পৌষ | 'প্রবাসী' | চাটগাঁ ও জলদস্যুগণ |
| | মাঘ | 'নবনূর' | একজন বাঙ্গালী মুসলমান বীর |
| ১৩১৩ | জ্যৈষ্ঠ | 'প্রবাসী' | শায়েস্তা খাঁর চাটগাঁ অধিকার |
| | অগ্রহায়ণ | 'প্রবাসী' | শাহজাহানের রাজ্যনাশ |
| | | 'প্রবাসী' | "সোণার তরী"র ব্যাখ্যা |
| ১৩১৪ | আষাঢ় | 'ভারত-মহিলা' | সতি-উন্-নিসা |
| | ভাদ্র | 'প্রবাসী' | দুই রকম কবি—হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ |
| ১৩১৫ | ভাদ্র | 'প্রবাসী' | সিয়ার-উল্-মুতাখ্খরীন্ |
| | আশ্বিন | 'প্রবাসী' | খুদাবক্স খাঁ বাহাদুর |
| ১৩১৬ | ফাল্গুন | 'প্রবাসী' | মুসলমান ভারতের ইতিহাসের উপকরণ |
| | | 'প্রবাসী' | বঙ্গভাষীদের জন্ত বিহারে কলেজ স্থাপন[১] |
| ১৩১৭ | মাঘ | 'প্রবাসী' | বাঙ্গালীর ভাষা ও সাহিত্য |
| | ২য় সংখ্যা | 'রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' | মালদহ উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির ভাষণ |
| ১৩১৮ | আশ্বিন | 'প্রবাসী' | বাদশাহী গল্প |
| | অগ্রহায়ণ | 'জাহ্নবী' | ৺রজনীকান্ত সেন |
| ১৩২০ | শ্রাবণ | 'প্রবাসী' | পূর্ব্ব-বঙ্গ[৩] |
| ১৩২১ | কার্ত্তিক | 'প্রবাসী' | মুর্শিদ কুলী খাঁর অভ্যুদয় |
| ১৩২২ | বৈশাখ | 'প্রবাসী' | বর্দ্ধমান বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে ইতিহাস-শাখার সভাপতির ভাষণ[৪] |
| | শ্রাবণ | 'প্রবাসী' | বাঙ্গালার ইতিহাস[৫] |
| ১৩২৩ | বৈশাখ | 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' | আওরাংজীবের পরিবারবর্গ |
| | আষাঢ়-শ্রাবণ | 'ভারতবর্ষ' | উইলিয়ম আর্ভিন, আই. সি. এস. |
| | মাঘ | 'প্রবাসী' | পাটনায় প্রাচীন চিত্র |
| | ফাল্গুন | 'ভারতবর্ষ' | পাটনার কথা[৬] |
| ১৩২৪ | আষাঢ় | 'প্রবাসী' | প্রবাসী বাঙ্গালী ও বঙ্গ-সাহিত্য |
| | শ্রাবণ | 'প্রবাসী' | বিশ্ব-বিদ্যা-সংগ্রহ |
| | ভাদ্র | 'ভারতবর্ষ' | 'বাঙ্গলার বেগম'[৭] |
| ১৩২৬ | আশ্বিন | 'প্রবাসী' | প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কিছু নূতন সংবাদ[৮] |
| | কার্ত্তিক | 'প্রবাসী' | মুসলমান আমলের ভারতশিল্প |
| | অগ্রহায়ণ | 'ভারতবর্ষ' | রামমোহন রায়ের কীর্ত্তি |
| | চৈত্র | 'ভারতবর্ষ' | মুঘল ভারতেতিহাসের লুপ্ত উপাদান |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৩২৭ | কার্ত্তিক | 'প্রবাসী' | প্রতাপাদিত্যের পতন* |
| | নিদাঘ সংখ্যা | 'প্রভাতী' | নূতনের মধ্যে পুরাতনের প্রকাশ |
| ১৩২৮ | বৈশাখ | 'ভারতবর্ষ' | অরাজক দিল্লী ( ১৭৪৯-৮৮ ) |
| | আষাঢ় | 'প্রবাসী' | প্রতাপাদিত্যের সভায় খ্রীষ্টান পাদ্রী[১০] |
| | শ্রাবণ | 'প্রবাসী' | বোকাইনগর কেল্লা ও উস্‌মান |
| | আশ্বিন | 'প্রবাসী' | আওরংজীব ও মন্দিরধ্বংস ঐতিহাসিক সত্য কি ? |
| | | 'প্রবাসী' | কেজো রসায়নের ওয়ার্কশপ |
| | অগ্রহায়ণ | 'প্রবাসী' | বঙ্গের শেষ পাঠান বীর |
| | মাঘ | 'শিক্ষক' | শিক্ষার আলোচনা কেন আবশ্যক ? |
| | নিদাঘ সংখ্যা | 'প্রভাতী' | দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা |
| | শীত সংখ্যা | 'প্রভাতী' | আওরংজীবের রাজত্বের হিন্দু ঐতিহাসিক |
| ১৩২৯ | বৈশাখ | 'প্রভাতী' | বাঙ্গলার একখানি প্রাচীন ইতিহাস আবিষ্কার |
| | আষাঢ় | 'ভারতবর্ষ' | আওরংজীবের সাতারা-অবরোধ |
| | ভাদ্র | 'প্রবাসী' | বাঙ্গলার স্বাধীন জমিদারদের পতন |
| | ভাদ্র | 'প্রভাতী' | ভারতের ঐশ্বর্য্য |
| | পৌষ | 'প্রভাতী' | ঐতিহাসিক ভীমসেন |
| | ফাল্গুন | 'প্রবাসী' | বঙ্গে মগ ও ফিরিঙ্গী |
| ১৩৩০ | পৌষ | 'প্রভাতী' | সম্রাট শাহ্‌জাহানের দৈনন্দিন জীবন |
| | মাঘ | 'প্রভাতী' | মুঘল শাহ্‌জাদার শিক্ষা |
| ১৩৩৩ | বৈশাখ | 'প্রবাসী' | কুমার দারার বেদান্ত চর্চা |
| ১৩৩৫ | চৈত্র | 'প্রবাসী' | মহারাষ্ট্র দেশ বা মারাঠা জাতি[১১] |
| ১৩৩৬ | বৈশাখ | 'প্রবাসী' | শিবাজীর অভ্যুদয় |
| | জ্যৈষ্ঠ | 'প্রবাসী' | শিবাজী ও আফজল খাঁ |
| | আষাঢ় | 'প্রবাসী' | শিবাজী ও মুঘল-শক্তির সংঘর্ষ |
| | শ্রাবণ | 'প্রবাসী' | শিবাজী ও আওরংজীব |
| | ভাদ্র | 'প্রবাসী' | চতুরে চতুরে : শিবাজী ও আওরংজীবের সাক্ষাৎ |
| | আশ্বিন | 'প্রবাসী' | শিবাজীর স্বাধীন রাজ্য স্থাপন |
| | কার্ত্তিক | 'প্রবাসী' | শিবাজীর দক্ষিণ বিজয় |
| | অগ্রহায়ণ-পৌষ | 'প্রবাসী' | পিতাপুত্রে |
| ১৩৩৭ | বৈশাখ | 'প্রবাসী' | আওরংজীবের জীবন-নাট্য |
| | শ্রাবণ | 'প্রবাসী' | নাদির শাহের অভ্যুদয় |
| | আশ্বিন | 'প্রবাসী' | ভারতে মুসলমান |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৩৩৭ | চৈত্র | 'প্রবাসী' | বঙ্গে বর্গী |
| | চৈত্র | 'উত্তরা' | ভাষণ[১২] |
| ১৩৩৮ | বৈশাখ-আষাঢ় | 'প্রবাসী' | বর্গীর হাঙ্গামা |
| | জ্যৈষ্ঠ | 'ভারতবর্ষ' | বিদ্যাসাগর |
| ১৩৩৯ | পৌষ | 'ভারতবর্ষ' | 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'[১৩] |
| | মাঘ | 'বঙ্গশ্রী' | মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস |
| | চৈত্র | 'বঙ্গশ্রী' | মারাঠা সৌভাগ্য-সূর্য্যের অবসান |
| ১৩৪০ | শ্রাবণ | 'ভারতবর্ষ' | নবীন বঙ্গের জীবন-প্রভাতের দৃশ্য[১৪] |
| ১৩৪১ | জ্যৈষ্ঠ | 'ভারতবর্ষ' | জাতীয় নাটকের বিকাশ[১৫] |
| | কার্তিক-পৌষ | 'বুলবুল' | ইতিহাসের গূঢ়তত্ত্ব[১৬] |
| | পৌষ | 'ভারতবর্ষ' | 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'[১৭] |
| ১৩৪২ | ৭ অগ্রহায়ণ | 'দেশ' | বাঙ্গালীর নিজস্ব বাণীমন্দির |
| | মাঘ | 'নূতন পত্রিকা' | ইসলামী সভ্যতার স্বরূপ কি ? |
| | ১ম সংখ্যা | 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' | বঙ্গে মুঘল-পাঠান সংঘর্ষ, ১৫৭৫ খ্রী: |
| | ২য় সংখ্যা | 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' | মহারাষ্ট্রে সাহিত্য ও ইতিহাস উদ্ধারের কাহিনী[১৯] |
| | ১ চৈত্র | 'দেশ' | মহারাজ দিব্য ও ভীম |
| | ২ চৈত্র | 'আনন্দবাজার পত্রিকা' | দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস[১৮] |
| ১৩৪৩ | ১ম সংখ্যা | 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' | মারাঠা জাতির অভ্যুদয়[১৯] |
| | | | শিবাজী[১৯] |
| | | | শিবাজীর পর মারাঠা ইতিহাসের ধারা[১৯] |
| | ৩০ আশ্বিন | 'এডুকেশন গেজেট' | বঙ্গের বাহিরে শক্তিপূজা |
| ১৩৪৪ | আষাঢ় | 'ভারতবর্ষ' | বেকার |
| | আষাঢ় | 'মাসিক বসুমতী' | বঙ্কিমচন্দ্র ও ইসলামীয় সমাজ |
| ১৩৪৫ | আষাঢ় | 'শনিবারের চিঠি' | বঙ্কিম প্রতিভা |
| | আশ্বিন | 'অলকা' | যুগধর্ম্ম ও সাহিত্য[২০] |
| | ১ম সংখ্যা | 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' | মুঘল ভারতের ঐতিহাসিকগণ |
| | ২য় সংখ্যা | 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' | মুসলমান-যুগে ভারতের ঐতিহাসিকগণ(১) |
| ১৩৪৬ | ২য় সংখ্যা | 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' | মুসলমান-যুগের ভারতের ঐতিহাসিকগণ(২) |
| ১৩৪৭ | ১ম সংখ্যা | 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' | রামমোহন রায়ের বিলাত যাত্রা |
| | ৪র্থ সংখ্যা | 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' | মধ্যযুগের বাঙ্গলার ইতিহাসের মশলা |
| ১৩৪৮ | আশ্বিন | 'শনিবারের চিঠি' | রবীন্দ্রনাথের একটি দান |
| | পৌষ | 'প্রবাসী' | মোহিনীমোহন চক্রবর্তীর স্মৃতি |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৩৪৯ | ১ম সংখ্যা | 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' | হীরেন্দ্রনাথ দত্ত |
| ১৩৫০ | ৩য় সংখ্যা | 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' | দুর্গেশনন্দিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি |
| ১৩৫১ | ১ম-২য় সংখ্যা | 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' | নাট্য-সাহিত্য কোথায় গেল ? |
| | চৈত্র | 'প্রবাসী' | আকবরের আমল |
| ১৩৫২ | মাঘ | 'প্রবাসী' | আর্য্যা নিবেদিতার নারী আদর্শ |
| | | 'প্রবাসী' | গবেষণার প্রণালী |
| | ফাল্গুন-চৈত্র | 'প্রবাসী' | পত্রাবলী |
| ১৩৫৪ | আশ্বিন | 'প্রবাসী' | স্বাধীনতার উষায় চিন্তা ( ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ ) |
| ১৩৫৫ | আশ্বিন | 'প্রবাসী' | দেশের ভবিষ্যৎ |
| | কার্ত্তিক | 'প্রাচী', শান্তিপুর | বাহিরের জগৎকে বাঙ্গলার দান |
| | পৌষ | 'প্রবাসী' | আমার জীবনের তন্ত্র |
| | চৈত্র | 'প্রবাসী' | বঙ্গ-সাহিত্যে ইতিহাসের সাধনা[২১] |
| ১৩৫৭ | ভাদ্র | 'ইতিহাস' | ইতিহাস এক মহাদেশ |
| | ফাল্গুন | 'প্রবাসী' | বাংলায় ঐতিহাসিক গবেষণার সমস্যা[২২] |
| ১৩৫৮ | অগ্রহায়ণ | 'ইতিহাস' | আওরঙ্গজেব-মুর্শীদকুলী পত্রালাপ ( আহ-কাম-ই-আলমগিরির রামপুর নবাবের ফার্সী হস্তলিপি হইতে অনূদিত ) |
| ১৩৫৯ | জ্যৈষ্ঠ | 'প্রবাসী' | বাংলার সমাজ-জীবন সমস্যা |
| | ভাদ্র | 'ইতিহাস' | ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশে পর্তুগীজ |
| ১৩৬০ | শারদীয় সংখ্যা | 'উষা' | খ্রীস্টান সম্প্রদায় সংস্কৃত শিক্ষার ভবিষ্যৎ |
| ১৩৬২ | ভাদ্র | 'প্রবাসী' | বাঙালীর অগ্রগতির পথ |
| | মাঘ | 'প্রবাসী' | রবীন্দ্রনাথের চক্ষে ভারতের অতীত |
| | চৈত্র | 'প্রবাসী' | পদ্য আর গদ্য |
| ১৩৬৩ | আষাঢ় | 'প্রবাসী' | বুদ্ধের কীর্ত্তি |

## বিভিন্ন পুস্তকে প্রকাশিত রচনা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৩১৬ | ফাল্গুন | ভাগলপুর সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য বিবরণ—মুসলমান ভারতের ইতিহাসের উপকরণ | |
| ১৩৩৯ | আশ্বিন | 'হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখামালা' ২য় খণ্ড | শিবাজী ও জয়সিংহ |
| ১৩৪২ | আষাঢ় | 'রজত জয়ন্তী' | আধুনিক ভারতে ইতিহাসের বিকাশ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৩৪৩ | আশ্বিন | চন্দননগর সাহিত্য-সম্মেলনের কার্যবিবরণ | ইতিহাস শাখার সভাপতির ভাষণ |
| ১৩৪৫ | আশ্বিন | 'বঙ্কিম প্রতিভা' | বঙ্কিম প্রতিভার ক্রমবিকাশ |

## ভূমিকা-সংবলিত গ্রন্থ

| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রাচীন ইতিহাসের গল্প | প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় | পৌষ | ১৩১৯ |
| প্রতাপসিংহ ॥ তৃতীয় সংস্করণ | সতীশচন্দ্র মিত্র | মে | ১৯২৭ |
| মোগল যুগে স্ত্রীশিক্ষা | ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | আষাঢ় | ১৩২৬ |
| জহান্-আরা | ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | জ্যৈষ্ঠ | ১৩২৭ |
| শিবাজী মহারাজ | ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | ফাল্গুন | ১৩৩৫ |
| ওমর খৈয়াম | সুরেশচন্দ্র নন্দী | ভাদ্র | ১৩৩৬ |
| আনন্দমঠ | পরিষৎ-সংস্করণ | আষাঢ় | ১৩৪৫ |
| দুর্গেশনন্দিনী | পরিষৎ-সংস্করণ | পৌষ | ১৩৪৫ |
| দেবী চৌধুরাণী | পরিষৎ-সংস্করণ | ভাদ্র | ১৩৪৬ |
| রাজসিংহ | পরিষৎ-সংস্করণ | শ্রাবণ | ১৩৪৭ |
| ছেলেদের বাবব | বাণী গুপ্ত | বৈশাখ | ১৩৫২ |
| সীতারাম ॥ দ্বিতীয় সংস্করণ | পরিষৎ-সংস্করণ | ফাল্গুন | ১৩৫২ |
| বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ | রেজাউল করিম | মে | ১৯৪৪ |
| বাঙ্গালীর ইতিহাস | নীহাররঞ্জন রায় | আশ্বিন | ১৩৫৬ |
| প্রাচীন কলিকাতা | হরিহর শেঠ | ভাদ্র | ১৩৫৯ |

---

১ ১৩৬৫, অগ্রহায়ণ 'শনিবারের চিঠি'তে পুনর্মুদ্রিত।
২ মথুরানাথ সিংহের নামে প্রকাশিত।
৩ যতীন্দ্রমোহন রায় লিখিত 'ঢাকার ইতিহাস'-এর সমালোচনা।
৪ ১৩৫৫, আশ্বিন 'শনিবারের চিঠি'তে পুনর্মুদ্রিত।
৫ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বাঙ্গলার ইতিহাস' প্রথম ভাগ-এর সমালোচনা।
৬ ইহা স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। পুস্তিকা সংখ্যক ১ দ্রষ্টব্য।
৭ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'বাংলার বেগম' (২য় সংস্করণ)-এর সমালোচনা।
৮ ১৩৫৫, আষাঢ় 'শনিবারের চিঠি'তে পুনর্মুদ্রিত।
৯ ১৩৫৫, জ্যৈষ্ঠ 'শনিবারের চিঠি'তে পুনর্মুদ্রিত।
১০ ১৩৫৫, আষাঢ় 'শনিবারের চিঠি'তে পুনর্মুদ্রিত।
১১ ইহা এবং পরবর্তী সাতটি প্রবন্ধ কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়া 'শিবাজী' পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।
১২ প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের নবম (আগ্রা) অধিবেশনের মূল সভাপতির ভাষণ।
১৩ সংবাদপত্রে সেকালের কথা [ ১ম খণ্ড ] সমালোচনা।

| | | | |
|---|---|---|---|
| মোগল পাঠান | ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | আষাঢ় | ১৩৫৯ |
| স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ | সরলাবালা সরকার | ভাদ্র | ১৩৬৩ |
| ভারতের মুক্তিসন্ধানী | যোগেশচন্দ্র বাগল | ফেব্রুয়ারি | ১৯৫৮ |
| ভগবৎ প্রসঙ্গ | হরিশচন্দ্র সিংহ | আগস্ট | ১৯৫৮ |

১৪ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' [ ২য় খণ্ড ] সমালোচনা।

১৫ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে'র সমালোচনা।

১৬ কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশনে ইতিহাস-শাখার উদ্বোধন বক্তৃতা।

১৭ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' [ ৩য় খণ্ড ] সমালোচনা।

১৮ রঞ্জন-পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত 'দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস'-এর সমালোচনা।

১৯ এই চারিটি প্রবন্ধই মারাঠা জাতীয় বিকাশ পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

২০ ১৩৬০, আষাঢ় 'ষষ্টি-মধু'তে পুনর্মুদ্রিত।
বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের সম্বর্দ্ধনার উত্তরে।

২১ মাঘ ১৩৫৫ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক অনুষ্ঠিত সম্বর্দ্ধনা সভার আচার্য্যের ভাষণ। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' ১৩৫৫, ৩য়-৪র্থ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।

২২ বঙ্গীয় ইতিহাস-পরিষৎ কর্তৃক ১৩৫৭ অগ্রহায়ণ মাসে অনুষ্ঠিত সম্বর্দ্ধনার উত্তরে। পুস্তিকা সংখ্যক ৫ দ্রষ্টব্য।

# আচার্য যদুনাথ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকাল সভাপতিরূপে এই প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব করিয়াছেন আচার্য যদুনাথ সরকার[১]; সহকারী সভাপতিরূপেও তিনি বহু বৎসর[২] এই পরিষদের সহিত যুক্ত ছিলেন; সহকারী সভাপতিরূপে প্রথম নির্বাচন মফস্বলবাসিরূপে 'নামমাত্র' হইলেও পরবর্তীকালে তিনি ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত যখন 'পালাক্রমে সভাপতি ও সহকারী সভাপতির পদ গ্রহণ' করেন তখন তাহা নামমাত্র ছিল না।

আর, এই দীর্ঘকালে সমালোচনাভাজন হইবার যতই কারণ ঘটুক, পরিষদের পক্ষে এই সময়টা গৌরব করিবারও অন্যতম কাল। বিশেষতঃ, যদি স্মরণ রাখা যায় যে, পরিষদের সূচনায় ও প্রথম পর্বে উহার সেবা যে অনেকের মনে দেশসেবা ও স্বদেশীব্রত-পালনের সমার্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে জন্য পরিষদের উদ্দেশ্য, "বাঙ্গালা-ভাষা ও বাঙ্গালা-সাহিত্যের অনুশীলন"-কর্মে বিশেষভাবে ব্রতী না হইয়াও অনেকে দেশানুরাগ-বশতঃ ইহার সেবক ও পোষক হইয়াছিলেন, সে ভাব কালের গতিতে সুচিরস্থায়ী হয় নাই; যদি এ কথা না ভুলি যে, রাষ্ট্রের বা বদান্য ব্যক্তির স্বতন্ত্র অর্থানুকূল্য ব্যতীত কেবল সদস্যদের মাসিক চাঁদায় এরূপ গবেষণা-প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা দূরে থাকুক, অস্তিত্ব রক্ষাই একরূপ অসম্ভব বলিয়া বিবেচ্য; যদি মনে রাখি যে এই অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল অর্থসংকট, যদুনাথ ও তাঁহার সহযোগিগণ পরিষদের কর্মভার গ্রহণ করিবার পূর্বে কি গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল[৩] তবে শত ত্রুটি-বিচ্যুতি, অভিযোগের কারণ যদিও থাকে তবু তাঁহারা পরিষৎকে রক্ষা ও নূতন পথে পরিচালনার গৌরব দাবি করিতে পারেন।

যদুনাথের এই বয়ঃকনিষ্ঠ সহযোগীদের মধ্যে বিশেষ ভাবে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম স্মরণ করি। প্রধানতঃ এই শিষ্যের আগ্রহেই যদুনাথ দীর্ঘকাল পরিষদের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং উপদেশ দ্বারা পরিষৎকে পরিচালিত করিয়াছেন। পরিষদের

---

১. সভাপতি—১৩৪১-৩, ১৩৪৭-৫১, ১৩৫৪

২. সহকারী সভাপতি—১৩২৫-৮, ১৩৩৪, ১৩৪১, ১৩৪৪-৬, ১৩৫২-৩, ১৩৫৫-৯, ১৩৬১-৫
বিশিষ্ট সদস্য—১৩৪৫

৩. "আমাদের বয়স্থ সদস্যদের স্মরণ থাকিবে, বারো বৎসর আগে পরিষদের আর্থিক অবস্থা কি ভীষণ শঙ্কাজনক ছিল; তখন কর্মচারীদের বেতন ছ মাস করিয়া বাকী থাকিত, কাগজের দাম, দৈনিক খরচ ও প্রেসের দেনার জের চলিত; এর উপর স্থায়ী তহবিল হইতে সাময়িকভাবে ধার লইয়া তাহাতেও বাজার দেনার আট হাজার টাকা ঘাটতি পড়িয়াছিল। দেনা শোধের পথ দেখা যাইত না, আট নয় হাজার টাকার উপর অনাদায়ী মাসিক চাঁদা খাতায় লেখা মাত্র ছিল। আর, আজ ক'বৎসর ধরিয়া সব কর্মচারীই ঠিক সময়ে বেতন পাইতেছেন, সুসময় দেখিয়া সকলকেই বেতন বৃদ্ধি, ভাতা এবং বোনাস দিয়া রক্ষা করিয়া হৃষ্টচিত্তের কাজ পাওয়া যাইতেছে। স্থায়ী তহবিলের সব পূর্বঋণ শোধ করিয়া, ঐ তহবিল বাড়াইয়া ষোল হাজার করা হইয়াছে।" ই

—যদুনাথ সরকার, সভাপতির অভিভাষণ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একপঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশন

কার্যপরিচালনায় সুব্যবস্থা, এবং পরিষদের উপযোগী গ্রন্থ সংকলন, সম্পাদন ও প্রকাশে ব্রজেন্দ্রনাথ জীবনের শেষ কয় বৎসর তাঁহার শক্তি ও সময় একরূপ সম্পূর্ণভাবেই নিয়োগ করিয়াছিলেন এ কথা অত্যুক্তি নয়। আচার্য যদুনাথের অভিজ্ঞতার সহিত শিষ্যের কর্মৈষণার শুভযোগেব ফলেই তিনি অনন্যব্রত হইয়া পরিষদের সেবা করিতে পারিয়াছিলেন।

পরিষদের একচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে আচার্য যদুনাথ বলিয়াছিলেন—

"আমরা এতদিন ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া, ধর্ম্ম ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশের দিক দিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আজ বঙ্গদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙ্গালা ভাষা অপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবে রাজাসন পাইয়াছে। এখন আমাদের কর্ত্তব্য যে, প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে নবীন যুগের উপযোগী সাহিত্য সৃষ্টি করা, নব্য-জ্ঞান-বিস্তার কার্য্যে বঙ্গ ভাষায় সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টি করা। এ কাজ না করিতে পারিলে আমাদের এই মহৎ প্রতিষ্ঠানটি ক্ষুণ্ণ ও খর্ব্ব হইয়া থাকিবে, ইহার নামের সার্থকতা লোপ পাইবে।"

আচার্য যদুনাথের নেতৃত্বকালেই, নবীন যুগের উপযোগী সাহিত্য সৃষ্টি না হউক, তাহা রক্ষা ও প্রচারের কর্তব্য পরিষৎ অনেকাংশে পালন করিয়াছেন, এই উদ্‌যোগ এখনও অব্যাহত আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিক উপলক্ষে তাঁহার যাবতীয় বাংলা ও ইংরেজী রচনার সুসম্পাদিত, সুমুদ্রিত, পাঠভেদ সম্বলিত সংস্করণ প্রকাশ এই উদ্‌যোগের প্রথম ফল[৪]. আচার্য যদুনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইতিপূর্বে আধুনিক যুগের কোনও বাঙালী লেখকের গ্রন্থাবলীর এরূপ সুসম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই, সে বিষয়ে পরিষৎ পথপ্রদর্শক। তদবধি পরিষৎ অনুরূপ ব্যবস্থায় উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর আরও অনেক কবি, নাট্যকার ও মনীষীর গ্রন্থাবলীর সুসম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, ও করিতেছেন, যেমন দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, (কবিতা ও গান), বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎকুমারী চৌধুরাণী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। ভারতচন্দ্র, রামমোহন ও মধুসূদনের গ্রন্থাবলীর নির্ভরযোগ্য সংস্করণও পরিষৎ প্রকাশ করিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ও বিহারিলাল চক্রবর্তীর প্রধান কয়েকখানি গ্রন্থের সুসম্পাদিত

---

৪. এই ও অন্যান্য গ্রন্থাবলী প্রকাশ পরিষদের পক্ষে বৈষয়িক উন্নতিরও কারণ হয়। ঝাড়গ্রামের রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব কর্তৃক ১৩৪৫ সনে প্রদত্ত দশ হাজার টাকার একটি ফণ্ড হইতে ইহার অনেকগুলিই মুদ্রিত হয়—একপঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশনে যদুনাথ সরকার বলেন—"এই সাত বৎসরে পরিষদের কর্ম্মীদের পরিচালনায় ফণ্ডের মূলধন বাড়িয়া ১৩৮০০৲ হইয়াছে, এবং ফণ্ডের প্রকাশিত ২৬,০০০৲ দামের পুস্তক বিক্রয়ের জন্য মজুদ আছে—অর্থাৎ সমস্ত খরচ বাদে ফণ্ডের মূলধন প্রায় চারিগুণ হইয়াছে।"

বৎসরের শেষে মুদ্রিত ও প্রচারিত আয়-ব্যয়ের হিসাব হইতে দেখা যাইবে ফণ্ডগুলি ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

সংস্করণও প্রকাশ করিয়াছেন। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রখ্যাত মনোবিকলনতাত্ত্বিক গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'স্বপ্ন' গ্রন্থও পরিষৎ পুনঃপ্রচার করিয়াছেন। ইহার প্রতেকটি গ্রন্থই সুসম্পাদিত হইয়া একাধারে সাধারণ পাঠক ও গবেষকের আনন্দের কারণ হইয়াছে।

এই তালিকা দীর্ঘ হইল; সুখের বিষয়, ইহা দীর্ঘতর হইতে পারিত। গত কুড়ি-বাইশ বৎসরে পরিষৎ যে-সকল প্রামাণিক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন ইহা তাহার একাংশের তালিকা মাত্র। এই সময়ে পরিষদের কর্মিগণ বাংলার সামাজিক ইতিহাসের বহু উপকরণ সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়াছেন, অনেক অধ্যায় রচনা করিয়াছেন। এই কুড়ি-বাইশ বৎসরের উদ্‌যোগে উনবিংশ শতাব্দীর ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের, বহু প্রধান সাহিত্যিকের পরিচয় উজ্জ্বল হইয়াছে, পরিচয় লাভের সুযোগ হইয়াছে। পরিষদের যে আর্থিক অবস্থা তাহার ফলে অনেক কর্তব্য অসম্পন্ন থাকিলেও, যাহা হইয়াছে তাহা কম কৃতিত্বের কথা নহে। ইহা সম্পূর্ণই যদুনাথের সভাপতিত্বকালে না হইলেও তাঁহার পরামর্শেই এ কাজ আরব্ধ হয়; তাঁহার সহযোগিগণ এই অর্থাভাবের মধ্যেও নিষ্ঠার দ্বারা কাজ বহু দূর অগ্রসর করিয়াছেন এবং এখনও অব্যাহত রাখিয়াছেন।

১৩৫৫ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আচার্য যদুনাথ সরকার মহাশয়কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। অভিনন্দনের উত্তরে যদুনাথ প্রসঙ্গক্রমে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নেতৃত্বে পরিষৎ কোন্ পথে প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে—

> "আমি যে এত বৎসর ধরে সাহিত্য-পরিষৎ পরিচালনা করেছি, কর্মীদের দৈনিক কাজেও পরামর্শে অতি নিকটভাবে সঙ্গী হয়ে আমাদের চেষ্টাগুলি ফলপ্রদ করবার সাহায্য করেছি,এর মধ্যে আমার একটি লক্ষ্য লুকানো ছিল। সেটি আজ প্রকাশ করে বলব। আমরা জানি যে সভা-সমিতি সর্ব্বোচ্চ সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে না; কারণ প্রতিভার জন্ম শুধু ভগবানের দয়ার উপরই নির্ভর করে, মানুষের পরিকল্পনা বা আয়োজনে হয় না। তবে আমরা কি করতে পারি? আমরা পারি—যেখানে প্রতিভা আগে থেকে জন্মেছে তার বিকাশে সাহায্য করতে, তাকে অকালে শুকিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে, তাকে পরিচিত সমাজে সমাদৃত করতে। এই হ'ল পরিষদের পক্ষে সম্ভব কাজ, এ কাজ আমাদের আগেও অনেক সভা-সমিতি এবং গুণগ্রাহী ধনী লোক করে এসেছেন।
>
> "কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল, বাঙালী সাহিত্য-কর্ম্মীদের চেষ্টা একটা বিশেষ দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া এবং সেই লক্ষ্যে দৃঢ় করে রাখা, যার ফলে বাঙালী-চরিত্রের এক দিক্‌কার অভাব পূরণ হবে এবং আমাদের এক শ্রেণীর কাজ স্থায়ী হয়ে থাকবে। এই অভিপ্রায়টি খুলে বলব।...
>
> "প্রথম থেকে আমার বিশেষ লক্ষ্য ছিল, কি ক'রে বঙ্গ-সাহিত্যের মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও কর্ম্মপ্রণালী আনা যায়? এই কাজের জন্য চাই, ন্যায়ের,তর্কের জন্য আবশ্যক তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার মস্তিষ্ক নয়,—যা শুধু খড় কাটতে পারে, তাবে উন্মত্ত বা

ভক্তিরসে অশ্রুসিক্ত শুষ্ক মস্তিষ্ক—যা মাটিতে গড়াগড়ি দেয়, তা নয়। এখন চাই—ধীর স্থির সংলগ্ন চিন্তাশক্তি, অসীম শ্রমশীলতা, পরীক্ষা না করে কোন কথা গ্রহণ করব না—এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা; সমস্ত উপকরণ একত্র ক'রে, সামঞ্জস্য ক'রে তার ভিতর থেকে সত্যের খাঁটি নির্য্যাস বের করব, এই মন্ত্রে দীক্ষা। অর্থাৎ এক কথায়, যাকে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি বলে। আমাদের সাহিত্য-পরিষৎ বর্ত্তমান যুগে এই কাজ আরম্ভ করেছে এবং তার এই প্রচেষ্টায় উপদেশ ও সাহায্য দিতে পেরে আমি চরিতার্থ হয়েছি।"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একপঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশনে 'পরিষদের সেবা হইতে বিদায়' প্রার্থনা করিয়া তিনি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে আশা ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করি—

"আমাদের তরুণ আগ্রহশীল কর্ম্মী চাই।···প্রকৃত কর্ম্মিগণ তরুণ না হইলে প্রতিষ্ঠান পঙ্গু হইয়া ক্রমে মারা যায়। আমরা নানা বিভাগে শ্রমী, সজাগ, স্বার্থত্যাগী, যুবক সাহিত্য-সেবক চাই। আমাদের ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, দীনেশচন্দ্র ও চিন্তাহরণ, সকলেই পরিণতবয়স্ক, বৃদ্ধ হইতে চলিয়াছেন। ইঁহাদের স্থান লইবার মত লোক কোথায় তৈয়ারী হইতেছে, আমি ত দেখিলাম না।···সকলের উপর চাই সদস্যগণের মধ্যে সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের স্পৃহা, সমবেত চেষ্টা করিবার আগ্রহ, প্রকৃত সাহিত্যসেবীর মনোবৃত্তি। ইহার অভাবে কোটি টাকার প্রতিষ্ঠানও বন্ধ্য হইয়া যায়, কালের কঠোর শাসনে প্রাণ হারায়। এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ স্থিরবুদ্ধি কর্ম্মঠ সেবকগণ পাইব, এই আশায় বুক বাঁধিয়া আছি। ইহাই আমার বিদায়-প্রার্থনা।"

এই প্রার্থনা সফল হইবে কি না, তাহার উপরেই পরিষদের ভবিষ্যৎ সার্থকতা নির্ভর করিয়া আছে।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

# বাঙ্গালীর নিজস্ব বাণী-মন্দির

যদুনাথ সরকার

কলিকাতা শহরে বাঙ্গালীর নিজস্ব কত বড় একটি সৃষ্টি আছে তাহা অনেকেই জানেন না। আমাদের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গের একটি বিশেষত্ব; ইহার মত দীর্ঘায়ু ও বহুলকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠান ভারতের আর কোন প্রদেশে নাই। অনেকে ভাবেন যে, এই পরিষৎ একটি সাহিত্য-সভা বিশেষ, এখানে শুধু মাসে মাসে প্রবন্ধ পাঠ হয়। কেহ বা মনে করেন যে, এটা পুস্তক প্রকাশের জন্য গঠিত কমিটী মাত্র। অনেকের আবার ধারণা, এ দেশীয় অনেক সমিতির মত ইহারও কাজ বৎসরে একদিন বিজ্ঞাপন দিয়া অধিবেশন করিয়া, বাকী ৩৬৪ দিন ঘুমাইয়া থাকা; কিন্তু এর কোনটিই সত্য নহে। আমাদের পরিষৎ এই সব শ্রেণীর সমিতি হইতে অনেক পৃথক এবং অনেক বৃহত্তর। ইহার অতীত কার্য্য এবং বর্ত্তমান বিভাগগুলির আলোচনা করিলেই ইহার প্রকৃত স্বরূপ এবং জাতীয় জীবনে উপকারিতা স্পষ্ট বুঝা যাইবে, অনেকের ভ্রমও দূর হইবে।

বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত পুস্তকের এবং হস্তলিখিত পুথির এত বৃহৎ ও সর্ব্বাঙ্গীণ সংগ্রহ ভারতের আর কোনও স্থানে নাই। ফলতঃ আমাদের প্রাদেশিক ভাষার অভিব্যক্তি ও ইতিহাস সম্বন্ধে যদি কেহ চর্চ্চা করিতে চান, তবে তাঁহাকে এই পরিষদের পুস্তকাগারে শ্রম করা ভিন্ন উপায় নাই। আর, আমাদের সংস্কৃত পুথির সংগ্রহ ও বহুমূল্য অন্যসবগুলি দানে পাওয়া। এমন কতকগুলি অপ্রকাশিত সংস্কৃত গ্রন্থ এখানে আছে যাহার দ্বিতীয় ভারতের অন্যত্র একখানি পাওয়া অসম্ভব। সুতরাং সংস্কৃত সাহিত্য-ইতিহাসেও যাঁহারা মৌলিক গবেষণা করিতে চান তাঁহাদের পক্ষে আমাদের পরিষদে একবার আসা আবশ্যক।

পরিষদ-মন্দিরের পশ্চিমাংশে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের স্মৃতি-ভবনে অনেক প্রস্তর মূর্ত্তি, অনুশাসন, মুদ্রা প্রভৃতি রক্ষিত হইয়াছে। এই প্রত্নতত্ত্ব বিভাগটি দ্রুত বাড়িয়া উঠিতেছে এবং পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বাঙ্গালীর পক্ষে কলিকাতায় নিজস্ব বলিয়া যদি কোন যাদুঘর থাকে, তবে তাহা ইহাই, কারণ চৌরঙ্গীর ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম ভারত গবর্নমেন্টের সম্পত্তি, তাঁহারা একদিনে হুকুম দিয়া উহা দিল্লীতে উঠাইয়া লইয়া যাইতে পারেন। বাঙ্গালীর যদি নিজের প্রদেশে সাধারণের সম্পত্তি করিয়া কোন প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন রাখিতে চান, তবে তাহা রমেশভবনে অথবা রাজসাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির মিউজিয়ামে দান করিবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকালয়ে যে কত অধিক সংখ্যক এবং অনেকস্থলে দুষ্প্রাপ্য দুর্ম্মূল্য মুদ্রিত বাঙ্গলা ইংরেজী সংস্কৃত গ্রন্থ আছে, তাহা অনেকেই জানেন না। আমাদের মফঃস্বলবাসী সদস্যগণও অনেক সময় ভুলিয়া যান যে, এই গ্রন্থাগার হইতে দু-তরফা ডাকব্যয়

দিয়া বই ধার লইবার অধিকার তাঁহাদের আছে। অবশ্য, এইরূপ অবস্থার জন্য আমরা ( পরিষদের কার্য্য-কর্ত্তারা ) অনেকটা দায়ী, কারণ আমরা এই সব পুস্তকের তালিকা মুদ্রিত করিতে বিলম্ব করিতেছি, মফঃস্বলে এমন কি কলিকাতার সদস্যগণ এইরূপে এক মহাজ্ঞান ভাণ্ডার হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিতেছেন।

কিন্তু উত্তর কলিকাতায় এক বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া এত বড় লাইব্রেরী আর একটিও নাই, এখানে প্রত্যহ বৈকালে প্রায় দেড়শ' পাঠক আসিয়া পুস্তক পড়েন ; ইঁহাদিগের কিছুই দিতে হয় না। তবে ঘরে বই লইয়া যাইতে হইলে সদস্য হওয়া চাই। কেহ যেন মনে না করেন যে "সাহিত্য-পরিষৎ" নামের সার্থকতার জন্য আমরা শুধু বাঙ্গলার ভাষাতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব অথবা প্রাচীন গ্রন্থমাত্র সংগ্রহ করিয়াছি। জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্র বাদ দিয়াছি। তাহা নহে, ইংরেজীতে নব্য বিজ্ঞান ছাড়া আর সব বিভাগেরই অনেক মূল্যবান বই এখানে আছে। আমাদের পূর্ব্ব সংগ্রহ বাদে চারিটি মহাপুরুষের বিখ্যাত বাছা বাছা গ্রন্থসংগ্রহ পরিষদ-ভবনে আশ্রয় পাইয়াছে, যথা - ৺পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ৺রমেশচন্দ্র দত্ত, ৺কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং ৺রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব। এগুলির তালিকা রচিত হইয়াছে। তাহা মুদ্রিত করিবার চেষ্টায় আছি।

একচল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ১৩০১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে ( ১৮৯৪ খ্রীঃ ) শোভাবাজার রাজবংশীয় স্বর্গগত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের আলয়ে, স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিবিধ উপায়ে বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্যের অনুশীলন এবং উন্নতি-সাধন এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব এবং বিবিধ বিজ্ঞানসম্পর্কিত গবেষণাও পরিষৎ তাহার অনুসন্ধান এবং আলোচনার বিষয়ীভূত করিয়া লইয়াছে। এই সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিষৎ যে-যে উপায় অবলম্বন করিয়াছে তাহার একটু বিস্তৃত বিবরণ এখানে দিতেছি ;—

(ক) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—প্রতিষ্ঠাবধি পরিষৎ এই নামে যে ত্রৈমাসিক পত্রিকাখানি প্রকাশ করিয়া আসিতেছে, তাহাতে চল্লিশ বৎসরে বাঙ্গালার চিন্তাশীল শ্রেষ্ঠ লেখকদের লেখনী-প্রসূত দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং গ্রাম্য ও প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ক মৌলিক গবেষণামূলক বহু অমূল্য প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। বিদ্বদ্‌বর্গ-সঙ্কলিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষাও পত্রিকার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছে।

(খ) গ্রন্থ প্রকাশ—পরিষৎ যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছে তাহার মধ্যে বৌদ্ধগান ও দোহা, চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও তাঁহার পদাবলী, বিবিধ পৌরাণিক গ্রন্থ ও শূণ্যপুরাণাদি, মঙ্গলকাব্য, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী, প্রস্তর ও তাম্রশাসন সম্পর্কিত লেখমালা, সংবাদপত্রে সেকালের কথা প্রভৃতি পুস্তক বঙ্গ-সাহিত্যে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। স্বর্গীয় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর, ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, মৌলভী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত,

রায় সাহেব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় প্রভৃতি পণ্ডিত ও মনীষীগণের সম্পাদনে তিরাশিখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে কয়েকখানির আবিষ্কারের সম্মান কোন কোন সম্পাদকের প্রাপ্য। সাহিত্য-পরিষৎ-কর্তৃক প্রকাশিত কয়েকখানি পুস্তক কলিকাতা, ঢাকা ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় সাদরে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিয়া লইয়াছেন।

(গ) পরিষদ্ গ্রন্থাগার—এই গ্রন্থাগার কেবল পরিষদের নিজস্ব সঞ্চয়ের দ্বারা সমৃদ্ধ হয় নাই। বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাগার, অক্ষয় দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রন্থাগার, রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব গ্রন্থাগার ছাড়া সাহিত্য সভা ও বান্ধব লাইব্রেরী প্রভৃতি বহু গ্রন্থাগারও পরিষদের অঙ্গীভূত হওয়ায় এই গ্রন্থাগার ভারতবর্ষের এক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসঞ্চয়ে পরিণত হইয়াছে। শুধু বাঙ্গালা নয়, ইংরেজী, সংস্কৃত, আরবি, ফার্সী, ল্যাটিন, গ্রীক, জার্মান, ফরাসী প্রভৃতি ভাষার দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, কাব্যসাহিত্য প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থরাজি এই সঞ্চয়ের অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থাগারে সকল শ্রেণীর পুস্তক সংখ্যা ৫০,০০০-এর উর্দ্ধে। বিশেষ অনুসন্ধিৎসু ও গবেষণাকারিগণকে পুস্তক পাঠের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। বহু প্রথম মুদ্রিত ও অধুনা দুষ্প্রাপ্য বাঙ্গালা পুস্তক এবং সাময়িক পত্রের বিপুল সংগ্রহ এই গ্রন্থাগারের বিশেষত্ব। বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে এবং অন্যান্য সংগ্রহের তালিকা প্রস্তুত হইতেছে।

(ঘ) পাঠাগার—এক ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ব্যতীত পরিষদের পাঠাগারের প্রাত্যহিক পাঠক-সংখ্যা ভারতবর্ষের যে কোন পাঠাগারের পাঠক-সংখ্যাকে নিঃসন্দেহে অতিক্রম করে। সদস্য এবং পাঠকগণের নিকট প্রত্যহ শতাধিক গ্রন্থের আদান-প্রদান হয়। প্রত্যহ দেড় শতের অধিক পাঠক পাঠাগারে বসিয়া সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্র এবং পুস্তকাদি পাঠ করে।

(ঙ) পুথিশালা—পুথিশালায় বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ফার্সী, তিব্বতী (টেঙ্গুর ও কেঙ্গুর), উড়িয়া, অসমীয়া প্রভৃতি প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির মধ্যে পাঁচ ছয় শত বৎসরের পুরাতন পুথিও আছে। রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, লালগোলার মহারাজ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, সেওড়াফুলির রাজবাটী, শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী প্রভৃতি বহু মনীষী ও সাহিত্য-প্রেমিকেরা ইহাতে পুথি দান করিয়াছেন। বর্ত্তমানে এই শ্রেণীর পুথির সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার দাঁড়াইয়াছে। কোন কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুথি, বিশিষ্ট পণ্ডিত দ্বারা সম্পাদনান্তে প্রকাশ করা হইয়াছে। কতকগুলি বাঙ্গালা পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং সংস্কৃত পুথির তালিকা প্রকাশিত হইতেছে।

(চ) চিত্রশালা—পরিষদের প্রথম সভাপতি ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামে প্রতিষ্ঠিত 'রমেশ-ভবনে'র (চিত্রশালা) সংগ্রহে প্রাচীন মুদ্রা, মূর্ত্তি, চিত্র, তাম্রশাসন, দলিল প্রভৃতি বহুবিধ দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য আছে। তন্মধ্যে ধাতু নির্ম্মিত তিনটি প্রাচীন বিষ্ণুমূর্ত্তি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতচন্দ্র, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কবি হেমচন্দ্র প্রভৃতির হস্তলিপি ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদি এবং রবীন্দ্র-সংগ্রহ ইহার অন্তর্গত। উপরন্তু,

(ছ) পরিষদ-মন্দিরে প্রায় সকল খ্যাতনামা সাহিত্যিকের মূর্ত্তি ও চিত্র সংরক্ষিত

আছে। ইহার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতির মূর্তি ও রবীন্দ্রনাথের মর্ম্মর-মূর্তিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ফলতঃ যেদিক দিয়াই দেখি না কেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গালীর অতি নিজস্ব সৃষ্টি, গৌরবের প্রতিষ্ঠান। এই জন্যই ইহার জন্ম হইতে এ পর্য্যন্ত এই পরিষৎ অনেক সুধী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অর্থ, সময় ও স্নেহ লাভ করিয়া আসিয়াছে; অসংখ্য পণ্ডিত প্রত্যহ অবৈতনিক পরিশ্রম করিয়া ইহার কার্য্য সফল করিয়া দিয়াছেন। ধনী অক্লান্ত ভাবে ধন দিয়াছেন। জ্ঞানী জ্ঞান বিতরণ করিয়াছেন, আর দরিদ্রতম বাণীর সন্তানও দেশ-সেবায় এই মন্দিরে নিজের সময় ও শক্তি অঞ্জলি দিয়াছেন।

বাঙ্গালী জাতি ইহাকে নিজ সঙ্ঘ-শক্তি দ্বারা বলীয়ান করিয়া তুলুন ইহাই কামনা।

'দেশ', ৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৪২

---

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া আচার্য যদুনাথ পরিষৎকে নানাভাবে সুগঠিত করিয়া তুলিবার জন্য যেমন উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন তেমনি সাধারণের সমক্ষেও পরিষদের পরিচয় উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার নিদর্শন স্বরূপ এই লেখাটি সংকলিত হইল। এই রচনা প্রকাশের পরে তাঁহার সভাপতিত্বকালে পরিষদের যে-সকল উন্নতি হইয়াছে অন্যত্র সংক্ষেপে তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত পরিষৎ-পরিচয়-রূপে এই রচনাটির উপযোগিতা এখনও অক্ষুণ্ণ আছে।

# স্মৃতিসভা

## অনুরূপা দেবী

বিগত ৫ আষাঢ় ১৩৬৫, ২০ জুন ১৯৫৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আহ্বানে স্বর্গীয়া অনুরূপা দেবীর স্মরণে রমেশ-ভবনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীসজনীকান্ত দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি অনুরূপা দেবীর প্রতিকৃতিতে মাল্যার্ঘ্য দান করিলে সভার কার্য আরম্ভ হয়।

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী অনুরূপা দেবীর সম্বন্ধে এই সভায় যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, ১৩৬৫ শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসী পত্রে তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার কোন কোন অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"এই সময়ের লেখিকাদের সাহিত্য-সাধনার কথা বলতে গেলে যা মনে পড়ে তা হচ্ছে তাঁদের সেই সেকালের সংস্কার কত বাধা কত বিধিনিষেধময় তাঁদের জীবন যাত্রার কথা। যাঁদের পিতামহীদের যুগে সংস্কার ছিল মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয়। বৈধব্যের আতঙ্ক ত কম কথা নয়, মেয়েরা ভয়ে ও পাড়ায় যেতে চাইতেন না, গুরুজনরাও যেতে দিতেন না। বেশী দিনের কথা নয়, মাত্র দেড়'শ বছর আগেই এই সংস্কার ছিল। অবশ্য অনুরূপা দেবীর যুগের অনেক আগের কথা বলছি। কিন্তু এ সংস্কার সেদিনেও ছিল এবং নিরক্ষর নারীতে অন্তঃপুর ভরা ছিল যা অল্পবিস্তর আমরাও দেখেছি; আর বিয়ের বয়সেরও অনেক বিধিনিষেধ ছিল। আট-দশ বছর বয়সের মধ্যেই যেন ঐ ব্যাপারটি চুকিয়ে নিতে পারলে ভাল হয়, এই মনোভাব। লেখাপড়ায় বৈধব্যভয়ের সংস্কারটা যদি-বা এড়ানো গিয়েছিল কিন্তু বিয়ের বয়সের নিয়মের বাধা সেদিনেও ছিল। সুতরাং 'কন্যাকাল'টি মাত্র দশ বছরে শেষ করে বধূ-জীবনের সীমানায় এসে পড়তে হ'ত। তারই মাঝে মাঝে কেউ কেউ যে ভাবে হোক কিছু লেখাপড়া শিখতেন, চর্চাও করতেন। কিন্তু সে চর্চা নিন্দনীয় ছিল বলে তা করতে হ'ত সঙ্গোপনে।...

"অনুরূপা দেবীরও বিয়ে হয় দশ বছর বয়সে। বিখ্যাত পণ্ডিত লেখক ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর পিতামহ ছিলেন। লেখাপড়া বাল্যেই কিছু শিখেছিলেন। কিন্তু সে শৈশবের শিক্ষা, পরিপূর্ণ মানুষের শিক্ষা নয়। কাজেই মনে হয় কন্যা ও বধূ-জীবনের নানা কর্তব্য ও কাজ কর্মের মাঝে, গৃহ-জীবনের পানসাজা ভাঁড়ারঘরের কাজ, ভাই-বোন, দেবর-ননদ সমাযুক্ত দুটি বৃহৎ পরিবারের কত ছোট বড় সংস্কার ও কাজের মাঝে তিনি নিজের চেষ্টায় আরও লেখাপড়া শিখেছিলেন এবং লেখার চর্চা শুরু করেছিলেন।

"সেই চর্চার ফলে কোথাও কোথাও কয়েকটা ছোট গল্প ও অন্য লেখার পর একটি উপন্যাস বেরল স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত 'ভারতী'তে 'পোষ্যপুত্র' নামে এবং পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিল। লেখিকা প্রথম কয়েক সংখ্যায় নাম দেন নি, পরে যখন

নাম দিলেন তখন লোকে বিশ্বাস করতে চায় না মেয়েদের লেখা। তাতে নামটিও তখনকার সর্বসাধারণের মত নয়। ঝরঝরে চমৎকার ভাষায় লেখা, কল্পনাও নিজস্ব, রচনাভঙ্গীও পরিচ্ছন্ন, আদর্শের ধারাও নিজস্ব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিচয় বহন করে এনেছে। সে সময়ে এমন লেখা নিয়ে স্বর্ণকুমারী দেবীর পর তুজন এসেছিলেন—অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবী। তুজনেই সমসাময়িক এবং উভয়ে পরম বন্ধুত্বসূত্রেও আবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু যাহোক, অনেকেই বললেন, এ লেখা নারীর ছদ্মনামে পুরুষের। সেটাও তাঁর অন্যতম প্রশংসাপত্রই বলা চলে। তাঁর লেখা পান্‌সে, জলো বা একঘেয়ে মেয়েলি লেখার মত নয়।

"একবার দেখেছি—'বসুমতী'র 'দেবী আসরে' তাঁর একটি সম্বর্দ্ধনা সভায়। বহু মহিলা এসেছিলেন। চমৎকার নিরহঙ্কার সৌজন্যময় ব্যবহার যেমন বাড়ীতে, তেমনি সভাতেও। প্রায় সব লেখিকাকেই চিনতেন। কারো নামে, কাউকে বা ব্যক্তিগতভাবে। সেদিনের সভায় সকলের সঙ্গেই মধুর সহজ সৌজন্যে ও স্নেহে আলাপ করলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিত্ব জ্ঞান ও সামাজিকতায় এঁরা পক্ষপাতী। সকলেই সসম্ভ্রমে তাঁর সম্বর্দ্ধনা সভায় যোগ দিয়েছিলেন। সেদিন তাঁর চরিত্রের স্নেহমধুর দিকটির কথা মনে থাকবে।"

"এর পরে তাঁর বহু লেখা—'বাগ্‌দত্তা,' 'মন্ত্রশক্তি,' 'মা,' 'মহানিশা,' 'রামগড়,' 'ত্রিবেণী প্রভৃতি উপন্যাস "ভারতী," "ভারতবর্ষ," এবং অন্যান্য নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখার পরিচয় দেবার কোন প্রয়োজন নেই, তিনি স্বনামধন্যা। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পোষ্যপুত্র' প্রকাশিত হওয়ার পর নারী-রচিত সাহিত্যেব ইতিহাসে আজও তিনি প্রধানতম ও বিশিষ্ট লেখিকা হয়ে আছেন।…"

"শ্রীসজনীকান্ত দাস মহাশয় বললেন, 'অনুরূপা দেবীর সাহিত্য জীবন তাঁর পিতামহ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আদর্শের ভাষ্য'… তা খুবই সত্য মনে হল। তাই হয়ত জীবনের শেষ দিকে তাঁর সাহিত্য খানিক প্রচারধর্মীও হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাঁর প্রথম-জীবনের খ্যাতি আজও অম্লান হয়ে আছে সাহিত্যক্ষেত্রে। তিনি এই সাহিত্যের ক্ষেত্রে আদর্শবাদে কারও অনুসরণ বা অনুকরণ করেন নি। সাহিত্য, জ্ঞান, আদর্শ ও ব্যক্তিত্বে অনুরূপা দেবী যে অটল অনমনীয় চরিত্রের মানুষ ছিলেন, সে যুগটা শেষ হয়ে গেল তাঁর সঙ্গে।"

শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য অনুরূপা দেবীর সহিত নানা বিষয়ে তাঁহার আলোচনার কথা বিবৃত করেন।

শ্রীসজনীকান্ত দাস অনুরূপা দেবীর সাহিত্যপ্রতিভার আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি 'সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী' আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন তাহা অসমীচীন হয় নাই। সমাজের সহিত সাহিত্যকে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলিয়া তিনি মনে করিতেন, সাহিত্যের সূত্রে আনন্দ-দানের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের পথনির্দেশের কর্ত্তব্যভারও এইজন্য তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

## যদুনাথ সরকার

বিগত ৬ আষাঢ় ১৩৬৫, ২১ জুন ১৯৫৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে আচার্য যদুনাথ সরকারের স্মরণে রমেশ-ভবনে একটি সভার অনুষ্ঠান হয়।

পরিষদের সভাপতি শ্রীসুশীলকুমার দে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি আচার্যদেবের প্রতিকৃতিকে মাল্যার্ঘ্য দান করিলে সভার কার্য আরম্ভ হয়।

আচার্য যদুনাথের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করিয়া শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ যে বক্তৃতা দেন নিম্নে তাহার সারাংশ মুদ্রিত হইল—

"আচার্য যদুনাথ সরকার বাল্যকালে তাঁর পিতার গ্রন্থাগারে মনোযোগ সহকারে ইতিহাসের বই পড়তেন। তাঁর পিতা ইতিহাস ও সাহিত্যের অনেক মূল্যবান বই সংগ্রহ করেছিলেন। এই গ্রন্থাগারেই যদুনাথের মনে ইতিহাস-প্রীতির বীজ উপ্ত হয়।

"আচার্য যদুনাথ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ের ভারতের ইতিহাস রচনা করেছেন। কি অসীম ধৈর্য, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে তাঁকে ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়েছে তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। দুই শতাব্দীব্যাপী ভারত ইতিহাসের অজ্ঞাত ও দুর্লভ তথ্য ও উপকরণ তিনি ফার্সী পুঁথিপত্র, রাজস্থানী নথিপত্র, পর্তুগীজ দলিল, ইংরাজ-কুঠির নথিপত্র, মরাঠী বখর ও পত্রাবলী, ফরাসী ভাষায় লেখা ব্যক্তিগত স্মৃতিচিত্র, প্যারিসের Bibliotheque Nationale ও ভারতের সরকারী মহাফেজখানায় রক্ষিত দলিলপত্রসমূহ থেকে সংগ্রহ করেছেন। দীর্ঘকাল অনুসন্ধানের পর তিনি যেভাবে Insha-i-Haft Anjuman গ্রন্থটি উদ্ধার করেছিলেন, তা বিস্ময়কর।

"যদুনাথের বিশ্বাস ছিল যে ইতিহাসের ঘটনাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে না দেখা পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। গভীর নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সঙ্গে তিনি একের পর এক ঘটনাবলী সাজিয়েছেন, একটি বিষয়ে মতামত দেওয়ার পূর্বে তাঁকে কত পুথিপত্র পাঠ করতে হয়েছে এবং এমন কি একটি স্থানের সঠিক অবস্থান নির্ণয়ের জন্য তাঁকে কতবার Survey of Indiaর বিভিন্ন মানচিত্র পরীক্ষা করে দেখতে হয়েছে। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে ইতিহাস কেবলমাত্র বিভিন্ন ঘটনার তথ্যপঞ্জী নয়, তথ্য যেমন নির্ভুল হওয়া দরকার, তেমনি তাকে মনোজ্ঞকরে প্রকাশ করতে হবে। যদুনাথের রচনারীতি ছিল অতি প্রাঞ্জল। তাঁর রচনায় ঐতিহাসিক নিষ্ঠা ও রচনাশৈলী এ দুয়ের অপূর্ব মিলন লক্ষ্য করা যায়।

"তথ্য যাতে নির্ভুল হয় সে বিষয়ে যদুনাথ সদা সতর্ক ছিলেন। তিনি একেবারে আকর-গ্রন্থ ও নথিপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিটি ঘটনা ও সমস্যার বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন, এ কারণে নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায় যে ভারত-ইতিহাসের মুঘল ও মারাঠা যুগের গবেষণার ক্ষেত্রে আচার্য যদুনাথ আপন আসনে দীর্ঘকাল স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত থাকবেন।"

শ্রীসজনীকান্ত দাস বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত আচার্য যদুনাথের সম্পর্ক, ও তাঁহার বাংলা রচনায় বিশিষ্ট সাহিত্যগুণের বিষয় আলোচনা করেন।

পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক

# স্বরলিপি

পুরাতন যে-সকল গান বাংলা সাহিত্যের সম্পদ, কিন্তু যাহার সুর এখন সেরূপ সুপ্রচারিত নহে, আধুনিক যুগের প্রধান কবিদের রচিত যে-সকল গান এখন বিস্মৃতপ্রায়, সে-সকল গানের স্বরলিপি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশের প্রযত্ন করা হইবে। বর্তমান সংখ্যায় বিহারিলাল চক্রবর্তীর রচিত গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হইল।—সঙ্গীত শ্রবণে ও রচনায় তরুণ বয়স হইতেই বিহারিলালের অনুরাগ ছিল। নবকৃষ্ণ ঘোষ লিখিয়াছেন—"বিহারিলাল বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন, এবং যাত্রা পাঁচালী বা কবির গানের কথা শুনিলেই তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া তাঁদের সঙ্গীতশ্রবণসাধ পরিতৃপ্ত করিতেন।... ভাবী কবি কেবল গীত শ্রবণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন না, বাটীতে আসিয়া সেগুলিকে স্বরলয়ে পুনরাবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিতেন এবং গীতের কোন অংশ বিস্মৃত হইলে তাহা নিজেই পূরণ করিয়া লইতেন। এইরূপ পররচিত গীতের অংশ পূরণ করিতে করিতে ক্রমে তিনি আপনি গীত রচনা আরম্ভ করেন।"[১]

রবীন্দ্রনাথ বালকবয়সের স্মৃতি-বিবরণে বিহারিলাল প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"[ বিহারীলাল ] ভাবে ভোর হইয়া [ আমাকে ] কবিতা শুনাইতেন, গানও গাহিতেন। গলায় যে তাঁহার সুর খুব বেশি ছিল তাহা নহে, একেবারে বেসুরাও তিনি ছিলেন না—যে সুরটা গাহিতেছেন তাহার একটা আন্দাজ পাওয়া যাইত। গম্ভীর গদ্‌গদকণ্ঠে চোখ বুজিয়া গান গাহিতেন, সুরে যাহা পৌঁছিত না ভাবে তাহা ভরিয়া তুলিতেন। তাঁহার কণ্ঠের সেই গানগুলি এখনো মনে পড়ে—'বালা খেলা করে চাঁদের কিরণে,'[২] 'কে রে বালা কিরণময়ী ব্রহ্মরন্ধ্রে বিহরে'[২] তাঁহার গানে সুর বসাইয়া আমিও তাহাকে কখনো কখনো শুনাইতে যাইতাম।[৩]

বিহারিলাল চক্রবর্তী-রচিত গানের যে স্বরলিপি প্রকাশিত হইল তাহা শ্রীযুক্তা ইন্দিরা-দেবী চৌধুরাণীর পুরাতন গান ও স্বরলিপির সংগ্রহ-পুস্তক হইতে গৃহীত। এই গান তিনি বাল্যকালে বাড়িতে শুনিয়াছেন এইরূপ বলিয়াছেন, সুর কাহার দেওয়া নিশ্চিত জানেন না। রবীন্দ্রনাথের হওয়া বিচিত্র নয়।

শ্রীযুক্তা ইন্দিরাদেবী গানের যে কথা দিয়াছেন তাহার সহিত বিহারিলালের গ্রন্থে মুদ্রিত পাঠের সামান্য পার্থক্য লক্ষণীয়।—পত্রিকাধ্যক্ষ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

---

১. প্রবাস, ফেব্রুয়ারি ১৯০০। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ২৫ সংখ্যায় উদ্ধৃত।

২ বিহারিলাল-রচিত গান।

৩. জীবনস্মৃতি, "সাহিত্যের সঙ্গী" অধ্যায়।

১

কীর্তন। দাদ্‌রা

পাগল মানুষ চেনা যায়
ও তার হাসি হাসি মুখশশী, খুসি ফোটে চেহারায়॥
সদাশিব সদানন্দ সরল অন্তর,
কেহ নাহি আপন পর;
ও সে জানে না দুনিয়াদারি, ভালোবাসে দুনিয়ায়॥
আপন ভাবে আপনি মগন,
ও তার ঢুলু ঢুলু ঢোলে দু নয়ন;
ও সে কি যেন মধুর বাঁশি সদাই শুনিতে পায়॥

কথা। বিহারীলাল চক্রবর্তী    স্বরলিপি। শ্রীইন্দিরাদেবী চৌধুরানী

। গা গা -সা II { গা গা -া । রা রা -গরা I সা -া -া । ( গা গা -সা ) } I
পা গ ল্ মা নু ষ্ চে না ০ ০ যা ০ য়্ পা গ ল্

। -া সা সা I { রা মা -া । পা পা -া I পা দপা -ণা । দা পা -া } I
০ ও তার্ হা সি ০ হা সি ০ মু খ০ ০ শ শী ০

I মা পা -া । পণা দা -পা I মপা গা -া । গমা -পা -া I -া -া -া ।
খু সি ০ ফো টে ০ চে০ হা ০ রা০ ০ ০ ০ ০ য়্

। গা গা -সা II
"পা গ ল্"

। -া -া -া II { সা রা -মা । মা -া -া I মা গমা -পা । পা -মা পা I
০ ০ ০ স দা ০ শি ০ ব্ স দা০ ০ ন ন্ দ

I গা গা -া । মা মা -া I পা -া -া । মা পা -া I
স র ০ ল অ ন্ ত ০ র্ কে হ ০

I গা গা -মা । গা রা -গরা I সা -া -া । ( -া -া -া ) } I -া পা ধা I
না হি ০ আ প ০ন্ প ০ র্ ০ ০ ০ ০ ও সে

I { ধা র্সা -া । নর্সা -র্রা র্সা I না না -র্সনা । ধা ধনধা -পা } I
জা নে ০ না০ ০ দু নি য়া ০০ দা রি০ ০

I পা ধা -া । পধা -না ধা I পা পমা -গা । গমা -পা -া I
ভা লো ০ বা০ ০ সে দু নি০ ০ য়া০ ০ ০

I -া -া -া । গা গা -সা II
০ ০ য়্ "পা গ ল্"